ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬১ বর্ষ ২২ সংখ্যা ।। ১৯ মাঘ, ১৪১৫ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১০) ২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

অনুপ্রবেশ রোধে বি এস এফের সীমান্ত-ফাঁড়িতে নজরদারি ক্যামেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অবাধে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ রোধে আরও সতর্ক হচ্ছে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বা বি এস এফ। অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রায়ই বি এস এফ জওয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। প্রধান অভিযোগ, টাকার বিনিময়ে বি এস এফের জওয়ানরাই মুসলিম বাংলাদেশীদের এদেশে চলে আসতে সাহায্য করে। তাই বি এস এফের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বাংলাদেশ সীমান্তের প্রতিটি বর্ডার আউটপোস্ট (বি পি ও)-তে ক্যামেরা বসানো হবে। এই ক্যামেরার ছবি তুলে পাঠানোর ক্ষমতা অনেক বেশি। স্যাটেলাইট প্রযুক্তির মাধ্যমে এই ক্যামেরার সংযোগ থাকবে বি এস এফের কলকাতার পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তর এবং দিল্লীর সদর কার্যালয়ে। অর্থাৎ এর ফলে বি এস এফের ডিজি যে কোনও সময় দিল্লীতে বসেই স্ক্রিনে দেখতে পারবেন পশ্চিমবঙ্গের পেট্রাপল, বনগাঁ, গেদে কিংবা জলঙ্গি সীমান্তে কী ঘটছে। জওয়ানরা তাঁদের ডিউটিতে সতর্ক আছেন কি না। কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে লোক পারাপার করছে কি না তাও দিল্লী থেকে সরাসরি জানা যাবে। প্রয়োজনীয় নির্দেশও পাঠানো যাবে।

এমন অভিনব ব্যবস্থা চালু হলে বি এস এফের ফাঁড়িগুলিতে বহুলাংশে দুর্নীতি কমবে বলে মনে করা হচ্ছে।

একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে, ২২১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তে তো ক্যামেরা বসানো সম্ভব নয়। এখনও সীমান্তের বহু অংশে ধূ-ধূ মাঠ। লোক পারাপার তো সেইসব অংশেই বেশি হয়। বি এস এফ কর্তারা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ সীমান্তে আরও বি ও পি তৈরির প্রস্তাব আছে। প্রায় ১০-১২টি নতুন বি ও পি কিছুদিনের মধ্যেই গড়ে তোলা হবে। ফাঁড়ির সংখ্যা বাড়লে ক্যামেরার সংখ্যাও বাড়বে। ফাঁড়িগুলির আশপাশ দিয়ে লোকজন এদেশে না ঢুকলে অনুপ্রবেশের সংখ্যা কমে যাবে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং বি এসএফ কর্তাদের যাবতীয় আশঙ্কা অবশ্য রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে। কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ করা, সীমান্তে রাস্তা তৈরি করা, ফ্লাডলাইট লাগানোর কাজে গড়িমসি করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সম্প্রতি দিল্লীতে রাজ্যের প্রতিনিধিদের ডেকে এনিয়ে সতর্কও করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। রাজ্য অবশ্য এনিয়ে যাবতীয় দায় বি এস এফের ঘাড়েই চাপিয়েছে।

প্রশাসনের কোনও অস্তিত্বই নেই

সংবিধানকে কলা দেখিয়ে গুরুংয়ের ‘গার্ড অব অনার’

গুড়পুরুষ।। লোকসভার নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসনের দৈন্যদশা ততটাই প্রতিদিন প্রকট হচ্ছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের বিস্তৃত জনজাতি বা আদিবাসী এলাকা থেকে দার্জিলিং পাহাড় পর্যন্ত কোথাও বুদ্ধবাবুদের সরকারি প্রশাসনের অস্তিত্বই নেই। দেশের সদ্য উদ্‌যাপিত প্রজাতন্ত্র দিবসে পশ্চিমবঙ্গই এখন একমাত্র রাজ্য যেখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মোকাবিলায় প্রশাসন চরম ব্যর্থ। রাজ্য প্রশাসনের অপদার্থতার সুযোগ নিয়ে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুং দেশের সংবিধানকে কলা দেখিয়ে কালিম্পং মহকুমার গরুবাথান এলাকায় আপার ফাগুতে প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালে গার্ড অব অনার নিয়েছেন। এটি সংবিধান বিরোধী কাজ। প্রজাতন্ত্র দিবসে কোনও জেলায় ও মহকুমায় গার্ড অফ অনার নিতে পারেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অথবা সেখানকার সর্বোচ্চ সরকারি প্রশাসন। বিমল গুরুং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বা সরকারি প্রশাসক কোনওটাই নন। পশ্চিমবঙ্গে যে সরকারি প্রশাসন ভেঙে পড়েছে তা বোঝা যায় বিমল গুরুংয়ের সংবিধান ও আইনকে বুড়ো আঙুল দেখানো থেকে।

বিমল গুরুং যে গার্ড অব অনার নিতে চলেছেন সে খবর জানা ছিল মহাকরণের মহারথী বুদ্ধবাবুর। মোর্চার প্রেস ও প্রচার সচিব বিনয় তামাং লিখিতভাবে সেকথা ঘোষণা করেছিলেন। ঘোষণায় বলা হয়, মোর্চার নিজস্ব গোর্খাল্যাণ্ড-পুলিশ সবুজ উর্দিতে সজ্জিত হয়ে সামরিক কায়দায় বিমল

।।

প্রজাতন্ত্র দিবসে কোনও জেলায় ও মহকুমায় গার্ড অফ অনার নিতে পারেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি অথবা সেখানকার সর্বোচ্চ সরকারি প্রশাসন। বিমল গুরুং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বা সরকারি প্রশাসক কোনওটাই নন।

।।

গুরুংকে গার্ড অব অনার দেবে। প্রসঙ্গত, বিমল গুরুংয়ের নির্দেশে ইতিমধ্যেই প্রায় চার হাজার যুবককে গোর্খাল্যাণ্ড পুলিশ বাহিনীতে নিযুক্ত করা হয়েছে। এই যুবকদের প্রশিক্ষণের জন্য আপার ফাগুতে শিবিরও স্থাপন করা হয়েছে। এতসব কিছুই হয়েছে রাজ্য সরকারের জ্ঞাতসারে। সব কিছু জেনেও বুদ্ধবাবু মোর্চার সাত সদস্যের প্রতিনিধিদের সঙ্গে শান্তি বৈঠক করেছেন। প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, গত ১৬ জানুয়ারি গরুবাথান এলাকায় মোর্চার মিছিলকে বাধা দেওয়া ও হাঙ্গামার জন্য অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদের সদস্যদের অবিলম্বে গ্রেফতার করা হবে। অথচ বুদ্ধবাবুর জানা ছিল যে, গরুবাথানসহ সমগ্র ডুয়ার্স এলাকাতে শান্তি রক্ষার জন্য ১৪৪ ধারা বলবৎ ছিল। সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই মোর্চার মিছিল শিলিগুড়ির দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। রাজ্যের পুলিশ ও প্রশাসন বাধা দেওয়ার কোনও চেষ্টাই করেনি। যে কাজ করা পুলিশের কর্তব্য ছিল, সেই কাজটি স্থানীয় চা বাগানের সঙ্গে যুক্ত আদিবাসীরা সেদিন করেছিল। আইন অমান্য করার জন্য মোর্চার সদস্যদের গ্রেফতার করার পরিবর্তে বুদ্ধদেববাবু আইন অমান্যে বাধাদানকারী আদিবাসীদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

একটা কথা স্পষ্ট যে, বুদ্ধদেববাবুরা যে কোনও মূল্যে মোর্চা নেতা বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে একটা সাময়িক আপোষ রফা করতে চাইছেন। বিনিময়ে তাঁরা চান দার্জিলিং

(এরপর ৪ পাতায়)

বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের বার্ষিক উৎসবে আহ্বান

একজন বনবাসী প্রধানমন্ত্রী চাই

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ‘‘আমেরিকা গিয়ে খৃস্টানদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় প্রধান, বর্তমান পোপ বেনেডিক্ট যোড়শকে ক্যালিফোর্নিয়ায় ফাদার-পাদ্রীদের জঘন্য কুকর্মের জন্য ক্ষমা চাইতে হয়েছে। ওখানে ১৪ হাজার নাবালককে শারীরিক নির্যাতন করার জন্য লক্ষ লক্ষ ডলার জরিমানাও দিতে হয়েছে। একথা শোনার পর কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডেও পোপের ক্ষমা প্রার্থনার দাবি উঠেছে একই কারণে। আর ইউরোপে যে হারে চার্চ নিলামে বিক্রি হচ্ছে আর নান- পাদ্রী, ফাদার-সিস্টারদের আকাল পড়েছে কবে হয়তো বা ভ্যাটিকানকেও লোকের অভাবে না বিক্রি করে দিতে হয়।’’

উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিশ্ববিভাগের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত প্রচারক রবিকুমারজী। শ্রীরবিকুমার গত ২৫ জানুয়ারি কলকাতার কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের কলকাতা ও হাওড়া মহানগর সমিতির ২৯তম বার্ষিক উৎসবে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখছিলেন। শ্রীরবিকুমার বলেন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রেরণায় বনবাসী, জনজাতি ও গিরিবাসীদের সার্বিক কল্যাণের উদ্দেশ্যেই বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কাজ শুরু হয়েছিল। কাজ অনেক বেড়েছে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। হাজার হাজার কার্যকর্তা বছরে ৩৬৫ দিন সময় দিয়েই কল্যাণ আশ্রমের কাজে যুক্ত এটা একটা বিশেষ দিক। কিন্তু প্রয়োজন আরও অনেক বেশি।

বক্তৃতা দিচ্ছেন রবিকুমারজী।

আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, ভারতে রাষ্ট্রপ্রধান এসেছেন দলিত ও মুসলমান সমাজ থেকে। কিন্তু বনবাসী সমাজ থেকে একজনও প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি হননি। সেজন্য আমাদের সকলকে আরও বেশি মনোযোগ সহকারে কাজ করে যেতে হবে। যাতে আমরা আমাদের জীবিতকালের মধ্যেই বনবাসী প্রধানমন্ত্রী দেখে যেতে পারি। একথা শোনামাত্র সভাগার ভর্তি শ্রোতারা তুমুল করতালিতে স্বাগত জানান।

শ্রীরবিকুমার আরও বলেন ১৯২৮ সালে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারত প্রথম স্বর্ণপদক লাভ করেছিল হকিতে। তখন ভারতীয় হকি দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন বনবাসী বন্ধু জয়পাল সিংজী। এখনকার সময়ে মণিপুরের বনবাসী মেরি কম তিনবার বক্সিং-এ চ্যাম্পিয়ান। কিন্তু তিনি টেনিসের সানিয়া মির্জা বা ক্রিকেটার শচীনের মতো কোনও সমীহ আদায় করতে পারেননি আমাদের কাছ থেকে। এরকমই বনবাসীদের মধ্যেও অনেক সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে, যা দেশকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা, সম্মান দেওয়াতে পারে।

সম্প্রতি কয়েকদিন প্রচারমাধ্যম জুড়ে রয়েছেন আমেরিকার নব নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বারাক হোসেন ওবামা। আমেরিকার ইতিহাসে বিগত ২০০ বছরের মধ্যে এই প্রথম কোনও আমেরিকান রাষ্ট্রপতি তাঁর প্রথম ভাষণে মুখ দিয়ে ‘হিন্দু’ শব্দ উচ্চারণ করলেন। ওবামা বলেছেন, আমেরিকা খৃস্টান, মুসলমান, ইহুদি ও হিন্দুদের দেশ। একথা হিন্দুত্বের স্বীকৃতির অন্যতম উদাহরণ। হিন্দুত্ব এখন বিশ্বব্যাপী ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে। পাঁচ বছর আগে বারাক হোসেন ওবামা সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, ‘আমি ধর্মে খৃস্টান’। সাংবাদিকরা তখন জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে যারা খৃস্টধর্মে বিশ্বাস করেন না, তারা সবাই নরকে পচে মরবে? ওবামার ঝটিতি জবাব ছিল ‘বাইবেল-এর ওই ভগবানকে আমি মানিনা, যে বলে অখৃস্টানরা নরকে পচে মরবে। ভারতের এক দশ বছরের বালক যীশুকে না-জানার জন্য নরকে যাবে। আমার ভগবান তাকে নরকে পাঠাবেন না।’ এটা হল ওবামার কথা। ১৭৮৯ সালে আমেরিকার প্রথম রাষ্ট্রপতি হন জর্জ ওয়াশিংটন তখন উনি, ত্রিপলি সন্ধি’র পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন,

(এরপর ১৬ পাতায়)

প্রজাতন্ত্র দিবসে সঙেঘর পথসঞ্চলন

২৬ জানুয়ারি, ডাফ্ স্ট্রীটে সমবেত স্বয়ংসেবকবৃন্দ। ছবি ঃ বাসুদেব পাল

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙঘ এবছর প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন করল রাষ্ট্রীয় পতাকা এবং গৈরিক পতাকা নিয়ে ব্যাণ্ডের তালে রীতিমতো পথসঞ্চ লনের মাধ্যমে। গত ২৬ জানুয়ারী সকালে সাড়ে দশটায় এই বর্ণাঢ্য সঞ্চ লন শুরু হয় কলকাতার নিবেদিতা পার্ক থেকে। প্রায় পাঁচশ' স্বয়ংসেবক ও দেড়শ' জনের ঘোষবাহিনী (ব্যাণ্ড) সহ ব্যাণ্ডের তালে পায়ে পা মিলিয়ে যাত্রা শুরু করে। ভূপেন বোস এভিনিউ, শ্যামবাজার, হাতিবাগান, অরবিন্দ সরণি, সেন্ট্রাল এভিনিউ, বিবেকানন্দ রোড, অভেদানন্দ রোড হয়ে ডাফ্ স্ট্রীটে সঞ্চ লন শেষ হয়।

ডাফ্ স্ট্রীটে স্বয়ংসেবকদের সামনে বক্তব্য রাখেন সঙেঘর অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ শ্রীকৃষ্ণজী মোতলগ। উপস্থিত ছিলেন ক্ষেত্র সঙঘচালক জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, মহানগর সঙঘচালক বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ক্ষেত্রের সহ প্রচারক অজিতভাই মহাপাত্র। প্রসঙ্গত, গত ২২ জানুয়ারি সন্ধ্যা থেকে ২৬ জানুয়ারি সকাল পর্যন্ত সঙেঘর দক্ষিণবঙ্গের এক ঘোষ শিবির তাঁতিবেড়িয়া শিশু মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। এই ঘোষবাদকদের বিশেষ বর্গে ১৩৬ জন স্বয়ংসেবক যোগ দেন। এবারের এই শিবিরের বৈশিষ্ট্য ছিল, শৃঙ্গদল (clarionet) বাহিনী। প্রদেশের ঘোষ বিভাগ প্রমুখ সুনীল সিং বর্গ পরিচালনা করেন।

নতুন ভোটারদের দলে টানতে বিজেপির বিশেষ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি।। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগেই নতুন ভোটারদের জন্য বিজেপি বিশেষ কর্মসূচী নিচ্ছে। এক্ষেত্রে দলের প্রধানমন্ত্রী পদ-প্রার্থী এল কে আদবানীর নেতৃত্বেই দল এই কর্মসূচীতে নামছে। আগামী লোকসভা নির্বাচনে ১০ কোটি নতুন যুব ভোটার প্রথমবার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে। যার মধ্যে আদবানীর নির্বাচনী ক্ষেত্রেই রয়েছে ২ লক্ষ ৭২ হাজার ৭৪৯ জন।

বিশাল পরিমাণ ওই ভোট লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীআদবানী যুব সমাজের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য ও আধুনিকমনস্ক হওয়ায় দল তাঁরই নেতৃত্বে এই অভিযান হাতে নিয়েছে।

দলের মধ্যে যুব ভোট বেশি করে টানতে বিজেপির যুব মোর্চা 'যুব জোড়' অভিযানে নামছে। যার নেতৃত্ব দেবেন স্বয়ং আদবানী। ৮১ বছর বয়সী শ্রীআদবানী আজও যুবকদের কাছে সমান গ্রহণযোগ্য। ফলে দল তাঁর নেতৃত্বেই বেশি করে আশার আলো দেখছে।

এই অভিযানে যুব ভোটারদের ওপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। যার মধ্যে থাকছে ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সীরা। এই লক্ষ্যে ভোটার লিস্ট 'ডাটাবেস' তৈরি হচ্ছে। এদের প্রত্যেকের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে এই তালিকা তৈরি করা হবে। যুব যুক্তকরণ কর্মসূচীর পাশাপাশি বিজেপি এদেশের ১৮

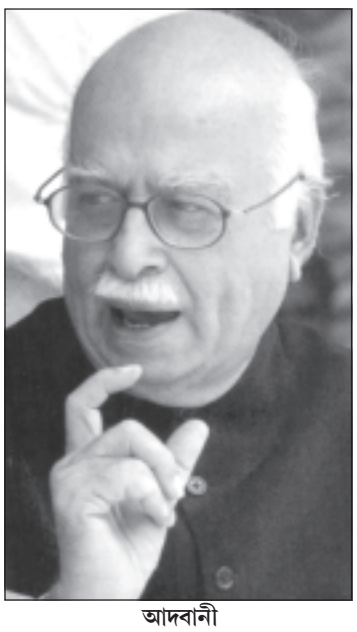

আদবানী

কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছানোর জন্যও একটি যোজনা হাতে নিয়েছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে দলের আদর্শ, নীতি তাদের কাছে তুলে ধরার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। আদবানী তাঁর নিজের ওয়েবসাইটে যুব সমাজের কাছ থেকে ভালো সাড়া পেয়েছেন বলেও জানা গেছে। দল একাজে তথ্যপ্রযুক্তিতে অভিজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবকদের কাজে লাগাবে। দলীয় সূত্রে আরও জানা গেছে। ইতিমধ্যেই দেড় হাজারের বেশি মানুষের সঙ্গে অনলাইন যোগাযাগ গড়ে উঠেছে। যা আগামী এক মাসের মধ্যে ১০ হাজার হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে যুব মোর্চার সভাপতি অমিত ঠক্কর বলেন, আমাদের প্রত্যেক কর্মীই প্রতি মুহূর্তে নতুনদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলছেন। একাজে শ্রীআদবানীর নেতৃত্বে দল এগোবে বলেও তিনি জানান। ইতিমধ্যে শ্রীআদবানী যুব সমাজের কাছ থেকে ভালো সাড়া পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

যুব মোর্চার সদস্য ও কর্মীরা ক্যান্টিন, কলেজ ক্যাম্পাস, ময়দান, কাফে সহ যুবকদের আলোচনাচক্রগুলিতেও নজর রাখছে। তাদের সঙ্গে যোগাযোগও করছে তারা। ২৬/১১ ঘটনার পর ভারতীয় রাজনীতিতে যুব ভোটের গুরুত্ব আবার নতুন করে উঠে আসছে। এক্ষেত্রে বিজেপির এই যোজনা রাজনীতির ক্ষেত্রেও শুভ সূচনা ঘটাবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

পাঠ্য পুস্তকে মার্কস-লেনিন

হি. স. কলকাতা ।। বিরোধী রাজনীতিকে দমন করার জন্য ও দেশের মনীষীদের প্রতি ছাত্র সমাজের মনকে বিষিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থকে চরিতার্থ করতে বামফ্রন্ট সরকার পাঠ্যপুস্তক থেকে সহজপাঠ এবং বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীদের জীবনী তুলে দিয়ে মার্কস-লেনিন-এর জীবনীকে ঠাঁই দিচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জী। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে উত্তর কলকাতায় স্বামীজীর বাসভবনে গিয়ে তিনি ওই কথা বলেন। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ রাজ্য থেকে বামফ্রন্টকে তারা উৎখাত করবেনই। তাই একবারে না পারলে শতবার সেই চেষ্টা তারা চালিয়ে যাবেন। সিপিএম নেতাদের প্রতি কটাক্ষ করে তিনি জানান, ঠান্ডা ঘরে বসে, মঞ্চে বসে থেকে তারা শুধু নির্দেশ দিয়েই আন্দোলন চালাতে চান। সেটা যে কত বড়ো মূখার্মি তা তাঁরা ইতিমধ্যেই পাচ্ছেন। তাঁর মতে, মাটিতে নেমে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে আন্দোলন করতে পারলেই সেই আন্দোলন যে সফল হয় তার প্রমাণ তারা হাতে নাতে পেয়েছেন। তাই তারা মাটির সঙ্গে , মানুষের সঙ্গে মিশে আন্দোলন চালিয়ে যেতে চান।

মমতার হঠকারিতায় বামেদেরই লাভ হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। খবরেপ্রকাশ ২০০১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৫৫টি আসনে ভোট কেটে তৃণমূলের পরাজয়ের কারণ ঘটিয়েছিল— স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে বিজেপিকে বাদ দিয়ে ভোট গড়লে লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল নেত্রী সাফল্য পাবেন কিনা? খবর পরিবেশনের ভঙ্গি এমন, যেন মমতা শিশুসুলভ নির্বুদ্ধি তায় বিজেপিকে গুরুত্ব না দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা চাইছেন! বাস্তবে তৃণমূলনেত্রীর এই মূল্যায়ণ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তিনি আদপেই নির্বোধ বা অপরিণামদর্শী নন। ২০০১ সালে রেলমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে বিজেপি-র সঙ্গ ত্যাগ। ২০০৬ সালের নির্বাচনে এন ডি এ-র শরিক হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কলকাতা পুরভোটে বাম-বিরোধী মহাজোট গঠনে সুব্রত মুখার্জীর প্রস্তাব প্রত্যাখান থেকে শুরু করে, বিগত পঞ্চ ায়েত নির্বাচনে মহাজোটে সামিল হলে দলীয় প্রার্থীদের বহিষ্কারের হুমকি এবং সম্প্রতিকালে বিজেপিকে আবার এড়িয়ে চলার চেষ্টা— নন্দরাম মার্কেটের সভামঞ্চে বিজেপি নেতা আছেন শুনে গাড়ি ঘুরিয়ে চম্পট — তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপই এক সুনিপুণ, সুপরিকল্পিত ছকের অঙ্গ। এই ছকের একমাত্র লক্ষ্য, নিজেকে রাজ্যের অবিসংবাদী বিরোধী নেত্রী হিসাবে তুলে ধরে বাস্তবে, সিপিএম তথা বামফ্রন্টকে প্রতিটি নির্বাচনে জেতার সুযোগ করে দেওয়া।

বলা বাহুল্য তিনি এই কাজে পুরোপুরি সফল (শুধু পঞ্চ ায়েত নির্বাচনে তাঁর অনেক 'ভাইরা' অনেক 'দিদির' ফতোয়া না মানায় এই প্রয়াস কিছুটা ধাক্কা খয়েছে।) তবে একদিকে মিডিয়ার সহযোগিতায় আমজনতার কাছে প্রকৃত বাম-বিরোধী নেত্রী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ, অন্যদিকে সি পি এম ও তার সহযোগীদের জয়ের পথ প্রশস্ত করার নেপথ্যে পেট্রো-ডলারের ভূমিকা কার্যকর কিনা খতিয়ে দেখা দরকার। কেননা পশ্চি মবঙ্গকে তাদের নিরাপদ করিডর এবং নিশিন্ত আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করার তাগিদে চূড়ান্ত সেকুলারবাদী বামপন্থীদের ক্ষমতায় রাখার ব্যাপারে জেহাদি জঙ্গিদের আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক। সেজন্য এই সরকারকে ক্ষমতায় রাখতে নানা কূটকৌশল অবলম্বন করতেই হবে।

মমতা

নিজেদের দক্ষতার জোরে জনপ্রিয়তার উপর নির্ভর করে ক্ষমতায় থাকার যোগ্যতা যে কমিউনিস্টদের থাকে না — তাও তাদের অজানা নয়! তৃণমূল নেত্রীর সংখ্যালঘু তোষণনীতি, বিশেষত মাঝে মাঝেই অসাংবিধানিক জেনেও মুসলিমদের জন্য চাকরি সংরক্ষণের দাবি তোলা এই সংবাদকেই দৃঢ় করে।

কন্যাভ্রূণ হত্যা

প্রতিবাদে সাধু-সন্তদের আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কন্যাভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন দেশের সাধু-সন্তরা। গত ১২ থেকে ১৬ ডিসেম্বর বৃন্দাবনে এক অনুষ্ঠানে সন্ত সমাজ কন্যাভ্রূণ হত্যা বন্ধের দাবি জানালেন। যোগগুরু স্বামী রামদেব

থেকে ভি এইচ পি-র প্রবীণভাই তোগাড়িয়া সকলেই কণ্যাভ্রূণ হত্যা বন্ধে সহমত প্রকাশ করেন। স্বামী রামদেব মাতৃ সমাজের এই রূপের কঠোর নিন্দা করেন। তিনি বলেন, আজ নারীই নারীকে গর্ভে হত্যা করছে।

বৃন্দাবনে বাৎসল্য গ্রাম যোজনার প্রবর্তক সাধবী ঋতাম্ভরার নেতৃত্বে সাধু-সন্তরা গত১৬ ডিসেম্বর এক ভবন নির্মাণ উপলক্ষে উপস্থিত হয়েছিলেন। এদিন কামকোটি পীঠের শঙ্করাচার্য স্বামী জয়েন্দ্র সরস্বতী মহারাজ, স্বামী রামদেব, বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ মুরলী মনোহর যোশী, সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ মদনদাসজী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ভবন নির্মাণের পাশাপাশি সর্বভারতীয় স্তরে কন্যাভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধ প্রচার অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সাধবী ঋতাম্ভরা উপস্থিত মহিলাদের ভ্রূণহত্যা রোধ করতে শপথবাক্য পাঠ করান। তিনি ভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে মহিলাদের গণস্বাক্ষর সম্বলিত একটি পত্র দেশের সন্ত সমাজের কাছে পেশ করেন।

সভায় উপস্থিত শঙ্করাচার্য স্বামী জয়েন্দ্র সরস্বতী পবিত্র বৃন্দাবনের মাটি থেকে ভ্রূণ হত্যা বন্ধ অভিযান-এর ডাক দেন। সঙ্ঘের সহ-সরকার্যবাহ মদনদাসজী বলেন, হিন্দু দর্শনের মধ্যে ভ্রূণ হত্যার কোনও স্থান নেই। এটি পুরোপুরি হিন্দু দর্শন বহির্ভূত কাজ। স্বাধবী ঋতাম্ভরা বলেন, দেবী ভবানীর পূজার সার্থকতা তখনই, যখন কন্যাভ্রূণ হত্যা বন্ধ হবে। দেশের প্রায় প্রতিটি প্রান্ত থেকে সন্তরা উপস্থিত ছিলেন। কন্যাভ্রূণ হত্যা বন্ধের পক্ষে এই প্রথম বড় আকারের প্রচার অভিযান শুরু হল। মহিলাদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। সকলেই ভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান জোরদার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বাগুইআটিতে অস্ত্রাগার কীসের লক্ষ্মণ

কলকাতা পুলিশের এলাকায় সি আই ডি-র হাতে আবিস্কৃত হইল বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর সরকারি অতিথিশালায় অবসর উদ্‌যাপনরত সাত আধুনিক শস্ত্রের কারবারিকে গ্রেপ্তারের পরই কলকাতার বাগুইআটির দেশবন্ধুনগরের জনৈক অনুপম চৌধুরীর বাড়িতেই অস্ত্রাগারের সন্ধান পাইল কলকাতা পুলিশ। কলকাতাকে ইসলামি জঙ্গিরা নিরাপদ আশ্রয় তথা গেটওয়ে হিসেবে ব্যবহার করিতেছে বলিয়া একদা মন্তব্য করিয়াছিলেন শান্তির মরূদ্যানের অধিপতি স্বয়ং। অবশ্য তিনি অনেক কথাই বলিয়া থাকেন যাহা পরবর্তীকালে অস্বীকার করিতে ইতঃস্তত করেন না। ইহা একরকম তাহার অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। বাগুইআটির এই বাড়ি একই সঙ্গে জঙ্গিদের আবাসস্থল এবং অস্ত্রাগারও। আবার যেমন-তেমন অস্ত্র নহে, অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। একে ৪৭ হইতেবেলজিয়ামে তৈরি ৯ এম এম পিস্তল, হাজার হাজার রাউণ্ড গুলি। এই সবের ফলে সাধারণ রাজ্যবাসীদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। নিজ খাসতালুকের পুলিশ গোয়েন্দারাই এই ভয়ানক আবিস্কার করিয়া শান্তির মরুদ্যানের বাস্তবিক চেহারাটি সর্বসমক্ষে নগ্ন করিয়া দিয়াছে। ইহার পরেও যদি বোদ্ধা বাহাদুরের দল দেশের উত্তমতম শান্তিশৃঙ্খলার রাজ্য বলিয়া বাগাড়ম্বর করিয়া থাকেন তবে তাহা শুনিলে বলিতে হইবে — 'কত্তা, আস্তে কন; ঘোড়ায় হাসব।'

পুলিশ সূত্রে এতাবৎ যাহা জানা গিয়াছে তাহা হইল — ওই সকল উদ্ধারকৃত অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে রাজ্যের ইচ্ছাপুর গান-শেল ফ্যাক্টরির তৈয়ারি অস্ত্রাদিও রহিয়াছে। সেইসঙ্গে ১২টি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র। জঙ্গি আর অস্ত্রাগার সঙ্গী হইলে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা এবং সাধারণ শান্তিপ্রিয় নিরীহ জনসাধারণ যে কী সুখে এরাজ্যে বসবাস করিতেছেন তাহা নতুন করিয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না। খোদ রাজধানীর এই পরিস্থিতি হইলে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ যে কী অবস্থার মধ্যে রহিয়াছেন তাহাও অনুমান করা কিছু কঠিন নহে।

আবার জানা গিয়াছে, ওই অস্ত্রাগার হইতে বহিঃরাজ্যে মাওবাদীদেরও অস্ত্রশস্ত্র-গোলা-বারুদ, গুলি প্রভৃতি যোগান দেওয়া হইত। পুলিশী জেরায় ধৃতরা স্বীকার করিয়াছে, লাগোয়া রাজ্য-বিহার-ঝাড়খন্ড তো বটেই, এমনকী ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদেরকে ওই 'মৌত কা সওদাগর'-এর দল অস্ত্রাদি যোগান দিত। আর তাহা যে, এদেশের বেশ কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং হাজার হাজার নিরাপত্তারক্ষীদের জীবন হরণ করিয়াছে জাতীয় ক্রাইম রিপোর্টের পরিসংখ্যানেই গাওয়া গিয়াছে। এতদিন বিহার-এর এতাদৃশ বেআইনী অস্ত্র-শস্ত্রের যোগানদাতা হিসাবে বদনাম ছিল। এইবারের ঘটনা মুখ্যমন্ত্রীর সফেদ পোষাকে কালির দাগ-এর অস্পষ্টতা সাধারণ জনসমক্ষের আরও উদঘাটিত করিয়া দিয়াছে।

সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় বেআইনী অস্ত্র-কারখানার হদিশ মিলিয়াছিল। এবার উত্তর ২৪ পরগণার রাজারহাটের দুস্কৃতীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। সে শুধু অন্তঃরাজ্য অস্ত্রের চোরাইচালানকারী নহে — অন্তঃরাষ্ট্রীয় আর্মস্ স্মাগলার বলিয়াই প্রাথমিক তদন্তে প্রকাশ পাইয়াছে। বাংলা, বিহার, উত্তর-দক্ষিণ এখন একাকার।

মুসলিমবহুল মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলার বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়া এপারে অস্ত্র-শস্ত্র, জঙ্গি আসিতেছে তাহা কোনও নতুন ঘটনা নহে। সি আই ডি-র অফিসাররা জানিতে পারিয়াছেন যে রাজারহাটের অশোক বাংলাদেশ হইতে কয়েক কোটি টাকার অ্যাসাইনমেন্ট সাপ্লাই লইতে মালদহে দলবলের সহিত গিয়াছিল। গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়িয়া যাইবার ফলে তাহার সব প্লান আপাতত চৌপাট হইয়া গিয়াছে। আরও খবর যে, সে নন্দীগ্রামে যুযুধান উভয়পক্ষকেই দীর্ঘদিন নিরবিচ্ছিন্নভাবে আগ্নেয়াস্ত্র যোগান দিয়াছে। এইকথা কখনও শাসক দল স্বীকার করে নাই দাপুটে সশস্ত্র মোটরবাইক বাহিনীর পশ্চাতে কাহারা রহিয়াছে। আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ঢালাও অস্ত্রের চোরাকারবার-এর নেপথ্য শিল্পী ও কুশীলব কাহারা তাহাও গোয়েন্দা পুলিশকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ধৃতরা যাহাদের এতদিন অস্ত্রশস্ত্র যোগান দিয়াছে সেই নরঘাতকরা কোন্ দলীয় রঙে রঞ্জিত তাহাও জনসমক্ষে শীঘ্রাতিশীঘ্র প্রকাশ করিতে হইবে। বিশেষত নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুর, ছোট আঙারিয়া প্রভৃতি একটার পর একটা জায়গা বারুদের গন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছে, পৈশাচিক হার্মাদ বাহিনী নরকপাল লইয়া গেন্ডুয়া খেলিয়াছে এবং পরবর্তীকালে জননী ইটভাটার সাগরেদদের ও ছোট আঙারিয়ার নায়কদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সিঙ্গুরের তাপসী হত্যার নায়কদের আদালতে শাস্তি হইয়াছে, ইহার পরিপ্রেক্ষিতে এই দাবি খুবই যুক্তিযুক্ত যে ইহার নেপথ্যে কোনও রঙের কারবারীরা কলকাঠি নাড়িতেছে তাহা অবশ্যই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ক্ষমতায় আসীন হইবার পর যে কথা বলিয়াছিলেন তাহাও তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে। একমাসের মধ্যে অবস্থার যে বিশেষ হেরফের হয় নাই তাহাও প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে বলিবার দায়িত্ব কেন্দ্র ও রাজ্যের।

বাগুইআটির ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহে। ইহা এক বৃহত্তর ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ। শাসক দল ও সরকারকে জনদরবারে জবাবদিহি করিতে হইবে — লোকচক্ষুর অগোচরে এই আগ্নেয়াস্ত্রের চোরাকারবারের কারবারী, গ্রাহক, পালক, বাহক কাহারা। বিপুল পরিমাণ অস্ত্র নিশ্চয়ই শূন্যে ভাসিয়া বাগুইআটি পৌঁছায় নাই। আগ্নেয়াস্ত্রের চোরাকারবারের সহিত অপরাধ ও অপরাধীদের বরাবর যোগসাজশ থাকেই। ন রহেগী বাঁশ তো, ন বাজেগী বাঁসুরী। এই বংশবৃক্ষকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপন, জনমনে সহজ জীবন যাপনের ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকেই করিতে হইবে।

ভোট-ব্যাঙ্ক রাজনীতিতে আক্রান্ত প্রজাতন্ত্র

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

আমাদের দেশের প্রশাসন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে কত দুর্বল, সেটা এবারের মুম্বাই কাণ্ড একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছে। অবশ্যই এটা নতুন কোনও ঘটনা নয় — এর আগে বহুবার এই ধরনের সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে — জয়পুর, গুজরাট, কাশ্মীর, কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর, অসম প্রভৃতি জায়গা রক্তস্নাত হয়েছে। হতাহত হয়েছেন অগণিত মানুষ। আর্থিক ক্ষতিও হয়েছে অনেক। বিমান ছিন্তাই করে, মন্ত্রী-কন্যাকে বন্দী করে, বাইরের সন্ত্রাসবাদীরা জেল থেকে কুখ্যাত অপরাধীদেরকে মুক্ত করেছে। বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে নানা জায়গায়। কখনও রেল, কখনও ব্রীজ উড়িয়ে দিয়েছে।

কিন্তু প্রশাসনের উচ্চতম স্তরে বা গোয়েন্দা-পুলিশের দপ্তরেও তেমন তৎপরতা দেখা যায়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের নরম রাজনীতি ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের নির্বিকার ভঙ্গির জন্য এই সন্ত্রাসবাদ দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করেছে। সমগ্র দেশটাই এখন হয়ে উঠেছে একটা বধ্যভূমি। আমরা যে বেঁচে আছি — এটা যেন এক বিস্ময়ের ব্যাপার।

কয়েক দশক ধরে পাকিস্তান এই সন্ত্রাসবাদের উৎস স্থল হয়ে উঠেছে, তেমনি বাংলাদেশেও রয়েছে অজস্র উগ্রপন্থী শিবির। কিন্তু বলিষ্ঠ নীতি এবং কূটনৈতিক তৎপরতার অভাবে নরমেধের সেই 'সাপ্লাই লাইন' আমাদের সরকার কেটে দিতে পারেনি। যুদ্ধ ছাড়াই ওই দুই দেশের ওপর চাপ সৃষ্টি করা যেত নানাভাবে। আমেরিকা বা ইজরায়েলের পদ্ধতিতে সন্ত্রাসের মোকাবিলা করা যেত, ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর সহযোগিতা লাভের জন্য হাত বাড়ানো যেত, উচ্চ কণ্ঠে তোলা যেতরাষ্ট্রসঙ্ঘে।

কিন্তু সেই ধরনের প্রয়াস কখনও দেখা যায়নি। আমাদের শাসকরা ক্ষমতা দখলের রাজনীতি নিয়ে যে উৎসাহ ও নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তার ছিটেফোঁটাও এই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়নি। আর প্রশাসনিক অকর্মণ্যতা ও ঢিলেমি ক্রমে সন্ত্রাসবাদকেই উৎসাহিত করেছে। ধ্বংসের একটা ঘটনা ঘটলে কিছুদিনের জন্যে 'রেড অ্যালার্ট' দেওয়া হয়েছে, পাহারা জোরদার করা হয়েছে, অকেজো বন্দুক পরিষ্কার করে প্রহরীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে উগ্রপন্থীদের এ কে-৪৭-এর মোকাবিলা করার জন্য। কিন্তু উচ্চতর মহলে চাপ সৃষ্টি করা যায়নি, তেমনি স্বরাষ্ট্রদপ্তর গোয়েন্দা বিভাগ, পুলিশ ও উপকূল রক্ষী বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করা হয়নি, কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা হয়নি, সারা দেশের জন্য কমাণ্ডো বাহিনীও তৈরি করা হয়নি।

আমাদের সরকার বারবার প্রতিবাদ করেছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কাছে। কখনও 'মৃদু', কখনও 'ঋজু' প্রতিবাদ করা হয়েছে। এবার 'ডেইমার্স্' পাঠানো হয়েছে কিন্তু কী লাভ হয়েছে তাতে? কুখ্যাত সন্ত্রাস নায়ক মাসুদকে ফেরৎ চাওয়া হয়েছিল। পাকিস্তান প্রথমে জানিয়েছিল তাকে গৃহবন্দী করা হয়েছে। পরে বলা হয়েছে সে পাকিস্তানেই নেই। আই এস আই-র প্রধানকে ডাকা হয়েছিল, কিন্তু তিনি আসবেন না। বাংলাদেশকে বহুবার বলা হয়েছে — জঙ্গি ঘাঁটিগুলো বন্ধ করার জন্য, সেগুলোর ঠিকানাও দেওয়া হয়েছে। অথচ সেই দেশের বক্তব্য হল — সেখানে কোনও জঙ্গি নেই, আর জঙ্গি ঘাঁটিও নেই।

এরপর আমাদের কর্তা-ব্যক্তিদের আর কিছু করণীয় নেই? আমেরিকার কণ্ডোলিজা রাইস পাকিস্তানের ওপর কিছুটা চাপ সৃষ্টি করেছেন। ইন্টারপোল-এর প্রধান ভারতে এসেছেন। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা মুম্বাই কাণ্ডে পাকিস্তানের ভূমিকা লক্ষ্য করেছে। ধৃত জঙ্গি যে পাকিস্তানী — সেটাও জানা গেছে। বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়েও সন্ত্রাসবাদ রপ্তানী করা হচ্ছে।

এই অবস্থাতেও কূটনৈতিক তৎপরতাকে তুঙ্গে তুলে নেওয়া যায় না? পূর্বোক্ত দুই দেশের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক, সেই সঙ্গে গড়ে তোলা হোক বিশ্ব জনমত। ১৯৭১-এর যুদ্ধের আগে ইন্দিরা গান্ধী যেমন দেশে দেশে দূত পাঠিয়ে একটা অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলেন, তেমন কিছু করা হোক।

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অবশ্য সরকার তড়িঘড়ি দুটো বিল পাশ করিয়ে নিয়েছে।

"কেন্দ্রীয় সরকারের নরম রাজনীতি ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের নির্বিকার ভঙ্গির জন্য সন্ত্রাসবাদ দিনে দিনে শক্তি সঞ্চয় করেছে। সমগ্র দেশটাই এখন হয়ে উঠেছে একটা বধ্যভূমি।"

এটা আনন্দের ব্যাপার যে, কোনও দলই নীতিগত দিক থেকে এর বিরুদ্ধে কিছু বলেনি। কিন্তু প্রশ্ন হল এত দেরীতে কেন? এর আগে সরকার এই ব্যাপোরেই 'টাডা' ও 'পোটা' হাতে পেয়েছিল — সেগুলোর প্রয়োগের ব্যাপারে কিছু বাড়াবাড়ির অভিযোগ উঠতেই তাদের প্রত্যাহার করা হল কেন? প্রয়োজনীয় সংশোধন ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের দোষ-ত্রুটি দূর করা যেত। কিন্তু স্পষ্টতই ভোটের রাজনীতির কথা ভেবেই সরকারকে পিছিয়ে আসতে হয়েছে। মুম্বাই কাণ্ডের পর জনমতের চাপেই পুরনো মদকে নতুন বোতলে ঢালতে হল। আসলে, এই সব নেতা-মন্ত্রীদের কাছে দেশ নয়, মানুষের নিরাপত্তা নয়, সবচেয়ে বড় জিনিস হল ভোট ব্যাঙ্ক।

সেই সঙ্গে আছে অপদার্থতা ও নিষ্ক্রিয়তাও। সংবাদপত্র থেকেই দুটো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। প্রথমত, এবারের মুম্বাই কাণ্ডের বহু আগেই আমেরিকা আমাদের স্বরাষ্ট্র-দপ্তরকে হুঁশিয়ার করেছিল। অন্তত দু'বার এই সতর্ক-বার্তা পাঠানো হয়েছিল প্রথমে গত বছরের অক্টোবরে ও নভেম্বরের গোড়ায়। বলা হয়েছিল — মুম্বাইয়ের তাজ হোটেলসহ বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গি হানা ঘটবে, বহু মানুষের মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করা হবে। এমন কী জানানো হয়েছিল করাচি থেকে জলপথে জঙ্গিরা এসে ভারতীয় ট্রলার দখল করে মুম্বাই তটে নামবে — সুতরাং সতর্ক রাখতে হবে উপকূল বাহিনীকে।

কিন্তু কুম্ভকর্ণদের নিদ্রাভঙ্গ হয়নি — মুম্বাই সরকারকে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিছু জানাননি। সম্প্রতি তিনি অবশ্য পদত্যাগ করেছেন। প্রশ্ন হল — ঠিক সেভাবেই জঙ্গি হানা ঘটেছে, হতাহত হয়েছেন কয়েক'শ মানুষ — মন্ত্রীর এই গাফিলতির দাম কারা দিলেন?

দ্বিতীয়ত, আমাদেরই "রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিক্যাল উইং" বা 'র' নভেম্বরের ১৮ তারিখে জানিয়েছিল — যে কোনও সময় তাজ, ওবেরয় প্রভৃতি হোটেলে জঙ্গিহানা ঘটতে পারে। মহারাষ্ট্র পুলিশ, নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ডকে এই সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু শুধু সেই সময় নয় — গত বছরের মার্চ মাসে এবং সেপ্টেম্বরেরও দু'বার এই ধরনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল — উপকূলের দিক থেকে আসতে পারে এই মর্মান্তিক আঘাত। আরও লক্ষণীয় ব্যাপার হল ২১ আগস্ট মহারাষ্ট্রের 'ফিসারমেন ইউনিয়ন' পুলিশকে জানিয়েছিল — বহু বেআইনি ট্রলার সমুদ্রে জলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সুতরাং এই ব্যাপারে সাবধান হওয়া উচিত।

এত কিছুর পরেও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হল না কেন? জঙ্গিরা জাহাজে এসে ট্রলার দখল করেই তো কূলে নেমেছে এবং তাজ, ওবেরয় ইত্যাদিতে হানা দিয়েছে। দেশ-বিদেশের সতর্ক-বার্তা সত্ত্বেও এই বীভৎসতাকে ঠেকানো গেল না কেন?

এক কর্তাব্যক্তি বলেছেন, আমাদের উপকূল এত দীর্ঘ যে, তাকে পাহারা দেওয়া কঠিন।

কিন্তু এটা শিক্ষিত ব্যক্তির যুক্তি হল? দেশটাকে আয়তনে ক্ষুদ্র করে নিলেই কি সমস্যা মিটে যাবে? আরও লক্ষ্য করার বিষয় হল — তাজ হোটেলে দশ জন জঙ্গি ৫৯ ঘন্টা লড়াই চালিয়েছে। বোঝা যায় যে, তাজের অলি-গলি তাদের নখদর্পণে ছিল। তাদের কেউ নাকি বোর্ডার হিসেবে, কেউ কিচেনে, কেউ পাহারার কাজে ছিল দীর্ঘদিন। এটা কেমন করে হয়?

হঠাৎ শুনছি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সন্ত্রাস দমনের জন্য একটা বিশেষ কম্যাণ্ডো বাহিনী গড়ে তুলবে নাম হবে এস আর টি — সার্চ অ্যাণ্ড রেসকিউ টিম'। কিন্তু এটা চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে'র মতো ব্যাপার নয়? এই রাজ্যে অন্তত এক কোটি অনুপ্রবেশকারী আছে। গত দু'বছরে ৬২ হাজার বাংলাদেশী ভিসা শেষ হওয়া সত্ত্বেও ফিরে যায়নি। বিধানসভার ৫৪টি আসনে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয় এদেরই ভোটে। স্থানীয় নেতাদের বদান্যতায় তারা রেশন কার্ড ভোটার কার্ড নিয়ে দিব্যি আছে। জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়া বা অন্য ভাবে সাহায্য করার ব্যাপারে তাদের কারও কারও হাত থাকতে পারে — সেই কথাটা চিন্তা করবে কে? প্রায় দু'কোটি পাকিস্তানী ও বাংলাদেশী ভারতে ছড়িয়ে থাকে, কেমন করে? অসমে দ্রুত গতিতে হিন্দু-মুসলমান অনুপাত বদলে যাচ্ছে কেন? তাদের সবাই খারাপ নিশ্চয় নয় — কিন্তু মৃত্যুকে শিয়রে নিয়ে এবার একটু নিরাপত্তার চিন্তা করা উচিত নয় কি?

এইসব ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে বাহিনী তৈরি করবে, তাকেও কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলতে হবে। আমাদের এক নৌ-কর্তা বলেছেন, গোয়েন্দা ও নৌবাহিনীর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ছিল।

কিন্তু এই 'পোস্টমর্টেম' থেকেই তো

(এরপর ৪ পাতায়)

এই সময়

ক্ষিপ্ত ওবামা

পাকিস্তান জঙ্গি দমনের টাকা সন্ত্রাস দমনে কাজে না লাগিয়ে, উল্টে সে টাকায় সন্ত্রাসে মদত জুগিয়েছে। মার্কিন প্রশাসন এর যথাযথ প্রমাণও হাতে পায়। তাই আর নয়! নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা নড়ে চড়ে বসলেন। পাকিস্তান জঙ্গি দমনে অর্থ ব্যয় না করলে, আর সাহায্য করা হবে না বলে তিনি পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন। ওবামা পূর্বসূরিদের ভুল সংশোধন করতেই এই ব্যবস্থা নিচ্ছেন। পাকিস্তানের অবস্থানে খুশি নন ওবামা।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

বৃটিশদের অত্যাচার এবং উৎপীড়ণ সত্ত্বেও, আজ ভারতবাসী ভারতীয়ত্বের বিজয় নিশান বিশ্বের সর্বত্র উড়িয়ে চলেছে। আর এখানেই ফুটে উঠে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যের মহিমা। সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে এমনই মন্তব্য করেন লালকৃষ্ণ আদবানি। অন্তরাষ্ট্রীয় সহযোগ পরিষদের ৩০ তম সম্মেলনে এসে আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের সাংস্কৃতিক পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধার কথাও আদবানি তুলে ধরেন।

উন্নয়ণে ফোন

তৃণমূল স্তরে আরও উন্নয়ণে জোর দিলেন শিবরাজ সিং চৌহান। এবার পানীয় জলের যেকোনও সমস্যায় ফোন করলেই সমাধান। রাজ্যের যেকোনও প্রান্ত থেকে বিনা খরচায় ফোন করা যাবে। ১৫৫৩৪৩ নম্বরে ফোন করে জানানো যাবে অভিযোগও। পানীয় জল ও স্যালো পাম্প বা জমির সেচ সংক্রান্ত সমস্যার মোকাবিলাতে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে কোনও ব্যক্তিই ১৫৫৩৪৩-এ ফোন করে অভিযোগ জানাতে পারবেন। কর্তৃপক্ষই ফোনের মাধ্যমে জানিয়ে দেবেন কবে, কখন সমস্যার সমাধান হবে।

বঞ্চি ত গ্রাম

গ্রামের মানুষ বঞ্চি ত। বঞ্চি ত করেছে খোদ বাম সরকার। গ্রামের রাস্তার পাকা করার জন্য ৩০ কোটি টাকা কাজেই লাগাতে পারেনি বামফ্রন্ট সরকার। পঞ্চ ায়েত ও গ্রামোন্নয়ণ দপ্তর বার বার দরপত্র আহ্বান জানালেও, রাজ্য সরকার তা দিতে পারেনি। শুধুমাত্র ঠিকাদারের অভাবেই কেন্দ্রের টাকা কাজে লাগাতে পারেনি বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য। অথচ ঠিকাদারদের সরকার হিসেবে যারা গর্ব করেন, তাদের এই করুণ অবস্থায় বিরোধীরা বেজায় খাপ্পা। অনেকের মতে এসবই বামফ্রন্টের দুর্বলতা।

আশার আলো

দেশ জুড়ে কর্মী ছাঁটাই-এর মাঝে আশার আলো দেখালেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজ্যে ১২ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে, ২৫ লক্ষ যুবকের কর্ম সংস্থানের পথ প্রশস্ত করলেন তিনি। সম্প্রতি দু'দিন ব্যাপী বিনিয়োগ সম্মেলনে তিনি এই ঘোষণা করেন। এই টাকা বিদ্যুৎ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, কৃষি, বায়ো-টেকনিক্যাল ক্ষেত্রে খরচ হবে। ইতিমধ্যেই তিনি রাজ্যে টাটার ন্যানো কারখানা স্থাপন করে, বাণিজ্যিক মহলের মন কেড়েছেন। দেশ-বিদেশ থেকে ২০ হাজার প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

বাতাসে গাড়ি

বাতাসে গাড়ি চলবে। শুনতে অবাক লাগলেও, এর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তৈরি করা হবে আধুনিক প্রযুক্তির ইঞ্জিন। যা পেট্রোল বা ডিজেল নয়, বাতাসের সাহায্যেই কাজ করবে। এই কাজ কোনও নাম না জানা কোম্পানী শুরু করছে না। বহুজাতিক কোম্পানীই এই কাজে হাত দিয়েছে। হয় তো খুব শীঘ্রই চোখের সামনে দেখা যাবে এগাড়ি। কোম্পানীর তালিকায় টাটা থেকে মহিন্দ্রার মতো সংস্থাও রয়েছে। বায়ুমণ্ডলের হাইড্রোজেনের সঙ্গে ২০ : ৮০ অনুপাতে সি এন জি মিশিয়ে এই গাড়ি চালানো হবে।

স্মৃতি ধবংস

বর্তমান কর্ম ব্যস্ততার মাঝে মোবাইল মানুষের নিত্য সঙ্গী। মোবাইলের অতিরিক্ত ব্যবহার বিষয়ে বিজ্ঞানীরা মানুষকে সজাগ করেছেন। সম্প্রতি সুইডেনের বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন মোবাইলের ব্যবহারের ফলে, স্মৃতিশক্তি লুপ্ত হতে পারে। সুইডেনের ল্যান্ড ইউনিভার্সিটির নিউরো সার্জারি বিভাগের বিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষা চালান। তাঁরা ইঁদুরের ওপর মোবাইল নিয়ে পরীক্ষা করেন। কিছুদিন পরে তাঁরা দেখেন মোবাইলের রেডিয়েশনের ফলে, ইঁদুরগুলো তাদের চেনা জিনিসও চিনতে পারছে না। বিজ্ঞানীরা এঘটনা মানুষের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে বলে জানিয়েছেন।

প্রচারে মোবাইল

সামনেই লোকসভা নির্বাচন। নির্বাচনী প্রচারের অঙ্গ হিসাবে মোবাইলকে ব্যবহার করতে চলেছে রাজনৈতিক দলগুলি। মোবাইলের মাধ্যমে দলের সঙ্গে সঙ্গে পদ প্রার্থীরও প্রচার চালানো হবে। সম্প্রতি আমেরিকায় মোবাইলের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রচার চালানো হয়। এতে যথেষ্ট লাভও হয়। সেই ধারাকে অনুসরণ করে, ভারতেও এবার মোবাইল ব্যবহার করা হচ্ছে। থার্ড জেনারেশনের কথা ভেবেই এই ব্যবস্থা। খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে বৈঠকে বসবে রাজনৈতিকদল ও মোবাইল পরিষেবাদাতারা।

আসল রূপ

মুক্তগণতন্ত্রের দেশ আমেরিকা কখনই ইসলাম বিরোধী নয় বলে মন্তব্য করলেন নব-নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক হুসেন ওবামা। ওয়াশিংটনে সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেন, এক শ্রেণীর মোল্লা-মৌলবী বিশ্বজুড়ে আমেরিকাকে ইসলামের শত্রু হিসাবে তুলে ধরতে তৎপর। এমনকী পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদে মদত ও উস্কানিমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারের হুঁশিয়ারিতে মৌলবাদীরা কৌশলে ইসলাম বিপন্ন বলে আমেরিকা বিরোধী হাওয়া তৈরি করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধ করছে। এই ধরনের আচরণ বিশ্ব শান্তির ক্ষেত্রে বিপজ্জনক বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিপাকে বাম

কেরলের রাজ্য সি পি এমের সম্পাদক পিনারাই বিজয়ন কাণ্ডের জের এরাজ্যের সি পি এম কর্তাদেরও বিপাকে ফেলেছে। আলিমুদ্দিন স্ট্রীটের কর্তারা এবিষয়ে রীতিমতো চিন্তিত। আগামী লোকসভা নির্বাচনে এরাজ্যেও তার প্রভাব পড়তে পারে বলে তাঁরা আশঙ্কা করছেন। ইতিমধ্যেই বিরোধীরা বিজয়নের ১১০ কোটি টাকার কেলেঙ্কারির ঢাক পেটাতে শুরু করেছে। বোলপুরের এক সভায় বিরোধীমহল এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে।

দারিদ্রতা বৃদ্ধি

একসময় বামপন্থীরা শ্লোগান দিত "কেউ খাবে, কেউ খাবে না — তা হবে না, তা হবে না"। শুধু তাই নয়, আজও কমরেডরা দেওয়াল লেখে— আমরা নিরপেক্ষ নই, আমরা মেহনতি মানুষের অর্থাৎ দীন-দরিদ্র মজুরদের পক্ষে। কিন্তু ৩২ বছরের বামশাসনে সেই দীন-দরিদ্র তো বটেই ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সরকারি পরিসংখ্যান তুলে ধরে তৃণমূল নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, দেশের মধ্যে পশ্চি মবঙ্গেই ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা সবচাইতে বেশি। রাজ্যে ৯.৭ শতাংশ মানুষ দু-বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। যার ফলস্বরূপ রাজ্যের মানুষের একটা বড় অংশকে অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগতে হচ্ছে। তবে কমরেডদের দেওয়াল লিখন কিন্তু চলছেই।

ব্যর্থতা

মানবিক পুলিশের আধুনিকীকরণের জন্য বরাদ্দ টাকা কাজেই লাগাতে পারেনি বাম সরকার। সম্প্রতি কেন্দ্রীয়স্তরে ঠিক হয় দেশের পুলিশি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ হবে। দেশের ছ'টি বড় শহরের জন্য কেন্দ্র সরকার অর্থও বরাদ্দ করে। এরাজ্যের জন্য ২৫৫ কোটি টাকার প্রস্তাব অনুমোদন লাভ করেছে। কিন্তু এত সবের পরেও শান্তির মরুদ্যানের রূপকার তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ। দেশজুড়ে সন্ত্রাসবাদী হামলার মাঝে পশ্চি মবঙ্গের এই করুণ অবস্থায় অনেকেই চিন্তিত।

প্রশাসনের কোনও অস্তিত্বই নেই

(১ পাতার পর)

লোকসভা আসনে সি পি এম প্রার্থীকে মোর্চা সমর্থন করুক। বিমল গুরুং সে কথা জানেন। আগামী ২-৩ মাস দর কষাকষি চলবে এবং সেই সুযোগে মোর্চা দার্জিলিং, কার্শিয়াং ও কালিম্পং এলাকায় নিজেদের ভিত মজবুত করবে। এই তিন এলাকায় রাজ্য প্রশাসনের অস্তিত্বই মুছে যাবে। যেমন, পশ্চি ম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলার আদিবাসী এলাকায় আজ রাজ্য প্রশাসনের অস্তিত্ব নেই। মাওবাদীদের প্রশাসনই সেখানে শেষ কথা বলে। প্রজাতন্ত্র দিবসে মাওবাদীদের নির্দেশে এই তিন জেলার আদিবাসী এলাকায় হওয়া বন্ধ সরকারি প্রশাসনের অসহায়তাকে বড় করুণভাবে প্রকাশ করেছে। বুদ্ধ বাবুদের পার্টিভজা পুলিশ ও প্রশাসনের মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে গেছে। তাই পশ্চি মবঙ্গকে বাঁচাতে গেলে ক্ষমতার অলিন্দে পালাবদল এখনই দরকার।

একটা কথা রাজ্যবাসীকে বুঝতে হবে যে, বিগত ৩০-৩১ বছরে রাজ্য সরকার আদিবাসী এলাকার উন্নয়নের জন্য প্রায় কিছুই করেনি। রাজ্যের অনুন্নত সম্প্রদায় উন্নয়ণ দফতরটি চালান সি পি এমের মন্ত্রী যোগেশ বর্মন। তাঁর দফতর বছরে ৩০০ কোটি টাকা খরচ করে দারিদ্র্য সীমার নীচে থাকা শিশু ও তাদের মায়েদের পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করতে। এই টাকাটা কেন্দ্র দেয় ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের মাধ্যমে। কিন্তু বাস্তবে এই বিপুল অর্থ বরাদ্দের ছিটেফোঁটাও আদিবাসী শিশু ও মায়েরা পান না। পেলে আজ লালগড় থেকে ক্ষমতাসীন লাল পার্টিকে উৎখাত হতে হতো না।

ভোট-ব্যাঙ্ক রাজনীতিতে আক্রান্ত প্রজাতন্ত্র

(৩ পাতার পর)

শিক্ষা নিতে হবে। স্বাধীনতার ছয় দশক পরেও যদি নিরাপত্তা ব্যবস্থা এত শিথিল হয়, তাহলে সাধারণ মানুষকেই অজস্র মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নেতা অফিসার কর্মীদের অকর্মণ্যতার দায় মেটাতে হবে। কার্গিল যুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছিল, পাক্-সৈন্যরা পাহাড়ের দখল নিয়ে বসে আছে — আমাদের সামরিক গোয়েন্দারা টের পায়নি। সেই ট্র্যাডিশান চলছে— রক্তস্নাত হচ্ছে সারা দেশ। মৃত্যুর প্রহর গুণে চলেছেন অসহায় ভারতবাসী।

আমাদের সংবিধানের ৬০ ও ১৫৯ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে যথাক্রমে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে শপথ নিতে হয় যে তাঁরা সংবিধান ও আইনকে রক্ষা করবেন এবং মানুষের সেবা ও সমৃদ্ধির (Service and well-bing of the People) কাজে আত্মনিমগ্ন হবেন। সংবিধানের তৃতীয় তপশীলে মন্ত্রীদের শপথের কথা আছে— তাঁরা মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধন করবেন। সরকারি অফিসার, পুলিশ, গোয়েন্দা ও অন্যান্য রক্ষীরাও মানুষের ট্যাক্সের টাকায় বেতন পান মানুষের হিতের জন্যই। কিন্তু সেবা, সমৃদ্ধি, কল্যাণ ইত্যাদি পরের কথা — জীবনের নিরাপত্তাই কী পাওয়া যাচ্ছে? দলীয় স্বার্থে আর ব্যক্তিগত লোভ দেশটাকে ঠেলে দিচ্ছে এক ভয়াবহ অন্ধকার ও মৃত্যুর দিকে।

আমরা আলোয় ফিরব কবে?

রাজ্য রাজনীতি

বুদ্ধ বাবুকে 'সেরা মুখ্যমন্ত্রী' বলেছিলেন কালো তালিকাভুক্ত আজিম প্রেমজী

নিশাকর সোম

কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ হয়। শোনা যায়, দংশিত ব্যক্তি নাকি কুকুরের ডাক ডাকে। আর জলে নামতে চায় না। রাজ্যের সি পি এম নেতাদের অবস্থা এরকমই। মমতার মোক্ষম কামড়ে মমতাঙ্ক হয়েছে। তাই খালি 'মমতা মমতা' করছে এবং মমতার ভয়ে উন্মাদ হয়ে গেছে। হিরণ্যকশিপু যেমন হরির নাম শুনতে পারতো না, তেমনি সি পি এমের পরাজিত পরিবহনমন্ত্রী, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলী তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্যামল চক্রবর্তী এক জনসভায় বলে ফেললেন, কেউ যেন মেয়ের নাম 'মমতা' না রাখে।

শ্যামল চক্রবর্তীর রাজনৈতিক মান এরকমই। যেমন বিনয় কোঙারের মান। সি পি এম নেতাদের মধ্যে ভদ্রতা, সৌজন্য, শিষ্টতা চলে গিয়ে এক অপসংস্কৃতির বাহক হয়েছে। এ যেন প্রবল জ্বরে ডিলিরিয়াম।

আর এক চক্রবর্তী, বর্তমান ক্রীড়া পরিবহনমন্ত্রী ভারতের ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলির সংবর্ধনা সভায় হঠাৎ গেয়ে উঠলেন, 'মহারাজ তোমাকে সেলাম'। এটি একটি স্ট্যান্টবাজি। কারণ, কিছুদিন আগেই তিনি সৌরভকে মুড়ির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। একেবারে সামারসল্ট। এরই নাম সুভাষ চক্রবর্তী।

গত ১৮ জানুয়ারি কলকাতা জেলা সি পি এমের নির্বাচনী প্রচারের উদ্বোধনে পদযাত্রা হল। এই পদযাত্রায় দুটি কৌতুকবহ দৃশ্য দেখা গেল। একটি হল পলিটব্যুরো সদস্য তথা সি পি এমের রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিমান বসু একটি লোহার রডে উড্ডীন পার্টি পতাকা ধরে হাঁটতে লাগলেন। ভালই করেছেন, কারণ পার্টির গুরুভার আর বইতে পারছেন না। তাই পার্টি পতাকা ধরে থাকাই ভাল। বিমানবাবু একসময়ে ডেব্রিজ-এর 'রেভ্যুলেশন ইন রেভ্যুলেশন' পুস্তকের ভক্ত ছিলেন। কলকাতার এই মিছিলে বিমানবাবুর এই প্রদর্শনী থেকে বোঝা যাচ্ছে, কলকাতায় পার্টির পতাকা ধরে রাখার শক্তিশালী নেতার অভাব রয়েছে। সদ্য সমাপ্ত পার্টির রাজ্য কমিটির সভায় আগামী লোকসভা নির্বাচন নিয়ে আলোচনায় দেখা গেছে, কলকাতার দুটো কেন্দ্রের মধ্যে দক্ষিণকে প্রায় ওয়াকওভার দিয়েছে। কারণ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর মধ্যে নির্বাচনী দায়িত্ব ভাগ করার ক্ষেত্রে কলকাতার জন্য জেলা সম্পাদক রঘুনাথ ও মহম্মদ সেলিমকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বলাই বাহুল্য, কেবলমাত্র উত্তর কলকাতা কেন্দ্রটিকেই হিসেবের মধ্যে ধরা হয়েছে। যদিও উত্তর কলকাতার বিশিষ্ট নেতা অলোক মজুমদার সরে যাবার পর একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। তাই অলোক মজুমদারকে পার্টিতে ফেরৎ আনা হয়েছে। ১৮ তারিখের মিছিলে অলোকবাবু ছিলেন, সেই ফটো বাজারী দৈনিকে তাঁকে দেখা গেছে।

রাজ্য নেতৃত্বের নির্বাচনী দায়িত্ব ভাগের সময়ে সাংগঠনিক ব্যর্থতার দরুণ কয়েকজন নেতাকে দায়িত্ব থেকে কার্যত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথমেই দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। তাঁর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার দায়িত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অসুস্থ, বৃদ্ধ বিনয় কোঙারের সঙ্গে যৌথ দায়িত্ব ছিল তাঁর। সম্পাদকমণ্ডলীর বক্তব্য, বিনয়বাবু চেষ্টা করলেও বুদ্ধ বাবু দক্ষিণ ২৪ পরগণার দলাদলিতে কিছুই করেননি— নীরব দর্শক ছিলেন। তাই বুদ্ধ দেববাবুর জায়গায় দক্ষিণ ২৪ পরগণার দায়িত্ব সুভাষ চক্রবর্তীকে দেওয়া হয়েছে।

এই কলামে একথা প্রায় তিনমাস

আজিম প্রেমজী

আগেই লেখা হয়েছিল। এই ভাবে রাজ্য কমিটি তথা কেন্দ্রীয় কমিটির নব্য সদস্য মৃদুল দে-কে নদীয়া জেলার দায়িত্ব থেকে অপসারিত করা হয়েছে। কারণ, মৃদুল দে-র ভূমিকার ফলেই নদীয়া জেলায় পার্টিতে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব চরমে উঠেছে। নদীয়া জেলার দায়িত্ব বিমানবাবু নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। তবে তাঁর সঙ্গে বড়দা অর্থাৎ অমিতাভ বসুকে ঠেকনো হিসাবে রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গৌতম দেবকে দক্ষিণ দিনাজপুরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

বিগত ৫ এবং ৬ তারিখের রাজ্য কমিটির সভা থেকে একটি রাজনৈতিক সাংগঠনিক নোট তৈরি করা হয়েছে। এই নোটে প্রকাশ যে, পার্টি কর্মীদের মধ্যে প্রোমোটারি, জমির দালালি, টাকা খেয়ে নিজের দলের প্রার্থীদের পরাজিত করার জন্য গোপনে কাজ করা এবং দুর্নীতির জট পার্টির শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে। এইজন্য পার্টির নীচের স্তরে সাংগঠনিক কনভেনশনের নাম করে সেফটি ভাল্‌ব বসানো হয়েছে। এইসব সম্মেলনে কথা উঠেছে, নেতৃত্বের মধ্যেই দুর্নীতি দেখা গেছে। মেদিনীপুরের জনৈক হাঁকডাকওয়ালা পার্টি সাংসদের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি কীভাবে কোটিপতিতে পরিণত হলেন? জনৈক মন্ত্রীর স্ত্রীর এন জি ও চলে কীভাবে? জনৈক মন্ত্রীকে ঠিকাদার কেন বাড়ি গিফ্‌ট দিলেন? জাল কিটের মালিকদের সঙ্গে পার্টির দহরম মহরম কার সঙ্গে ছিল? জনৈক মন্ত্রীর এক ঘনিষ্ঠ বাসের সামান্য কর্মচারী (স্টার্টার) থেকে কোটিপতি হয়েছেন কীভাবে? কলকাতার জনৈক বিধায়কের ঘনিষ্ঠরা একাধিক গাড়ি-বাড়ি-ফ্ল্যাট করেছেন। পার্টি সদস্যদের একাংশের মধ্যে পান-দোষ এবং মহিলা আসক্তি নাকি দেখা যাচ্ছে। সমালোচনা উঠেছে, পার্টির নেতা কর্মীরা নিজেদের ক্ষুদে 'হিটলার'-এ পরিণত করেছে।

দীর্ঘ তিন দশক ধরে সযত্নে যে ম্যাসলম্যানদের নেতারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তৈরি করেছেন তা এখন ব্যুমেরাং হচ্ছে। বোতলের দৈত্যকে ছিপি খুলে বের করা হয়েছে। এই দৈত্যই শেষ করবে। না-পরা, না-খাওয়া পার্টি কর্মীরা বেকার পার্টি সদস্য সমর্থকরা আর শুধু রাজনৈতিক কপচানিতে ভুলছে না বলে তাদের শত্রুর হাতে মার খাওয়ার ভয় দেখানো হচ্ছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাদের মার দেওয়াও হচ্ছে।

পার্টির অভ্যন্তরীণ সমস্যায় দীর্ণ সি পি এম নেতৃত্ব তথা মন্ত্রীগণ। এছাড়া রাজ্যের সমস্যা দেখা যাচ্ছে — (১) পাহাড়ের আন্দোলন, (২) পৃথক কোচবিহারের আন্দোলন, (৩) ঝাড়খণ্ড দিশম পার্টির উত্থান।

এই সব কারণে সি পি এমের রাজ্য নেতৃত্ব বামফ্রন্টের ঐক্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তা ফেরবার নয়। একটি উদাহরণ এখন দিচ্ছি। আর এস পির যুব সংগঠনের সম্মেলনে আর এস পির নেতা ও মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী যে বক্তৃতা দিয়েছেন, তার সারাংশ হল— উইপ্রোর মালিক আজিম প্রেমজি মুখ্যমন্ত্রীর পিঠ চাপড়ে সেরা মুখ্যমন্ত্রীর শিরোপা দিলেন। মুখ্যমন্ত্রী গদগদ হয়ে উঠেছিলেন। কি হল এখন? প্রেমজির জোচ্চুরি ধরা পড়ে গেল। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একজন চোরের সার্টিফিকেট পেলেন।

টাটাকে সস্তায় জমি দেওয়া এবং আর্থিক নানা সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত কোথায় হয়েছিল? আমরা দুটো ছবিতে দেখেছি, মুখ্যমন্ত্রী টাটার সঙ্গে জড়াজড়ি করে রয়েছেন। 'কমরেড টাটা' কলা দেখিয়ে চলে গেলেন।

৩২ বছরে আমরা কিছু করিনি। অতীতের আন্দোলনের ফল-কে পুঁজিবাদীদের দালালিতে পরিণত করেছি। বেকার সমস্যা সমাধানের কথা শূন্যগর্ভ আওয়াজ। সি পি এমের যুব সংগঠন মেষবৃত্তি অবলম্বন করেছে।

এর বিরুদ্ধে কথা বললেই 'ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা' করার প্রক্রিয়া চলছে। দালালি চলছে। চীনেও যুবতীদের সৌন্দর্য প্রদর্শনী, পরীক্ষায় টোকাটুকি চলছে।

এই বক্তৃতা শোনার পর কী আর এস পি সমর্থকরা আর বামফ্রন্টকে ভোট দেবেন?

আর সি পি এমের যুব সংগঠন যতই উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ার ঢক্কা-নিনাদ করুক না কেন, রাজ্যের যুব সমাজের মধ্যে অবক্ষয় দেখা যাচ্ছে। মেধাবী ছাত্ররা ডাকাতি করছে। যুবক-যুবতীদের মধ্যে মদ্যপানের হিড়িক পড়ে গেছে। যুবক-যুবতীদের মধ্যে যৌনলালসা প্রকটিত হচ্ছে। যৌন বিকৃতি ঘটেছে। আদর্শ নেই বলেই। তাই তো দেখছি, সি পি এমের ছাত্র নেতা ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত।

লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিল এরাজ্যে কংগ্রেস। প্রণব মুখার্জী আবার প্রদেশ সভাপতি, দুটি কমিটিও ঘোষিত হয়েছে। প্রিয়রঞ্জন-জায়া দীপা দুটি কমিটিতেই আছেন। সুব্রতবাবুকে প্রচারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আবার মহসিনা কিদোয়াইকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য কংগ্রেসের। তৃণমূলের সঙ্গে জোট বাঁধার শর্ত তৈরি হচ্ছে। এদিকে মমতা বলেছেন, কোনও দলের চাপের কাছে মাথা নোওয়াবো না। একলা চলতে ভয় পাই না। সি পি এম এজেন্ট ছেড়েছে, ঐক্য না করার জন্য।

মমতা দেবী মতুয়াদের সভায় গিয়ে বলেছেন, তাঁকে মতুয়া সংঘের সামান্য সাধারণ সদস্য করে নেওয়ার জন্য। মতুয়াদের বড়মা বীণাপাণি দেবীর বক্তব্য ছিল। মমতাই তাঁর পরে মতুয়াদের পরিচালক হবেন। এই শুনে মমতা কেঁদে ফেলেন। ধর্মীয় সংগঠন নিয়ে রাজনীতি করার পাপ শুধু কি বিজেপির লাগে?

বিজেপিকে কোণঠাসা করার রাজনীতি চলছে। যদিও তলায় বাম-ডান সব দলের সাধারণ সমর্থকরা সি পি এম বধের জন্য তৈরি হচ্ছে। এই অনুভূতি কি নেতা-নেত্রীদের মনে দাগ কাটছে?

অন্য রকম

কারা-মন্দির

এখানেও সন্ধ্যা হয়। রাত্রির শেষে সকাল হয়। পূর্ব আকাশে সূর্য ওঠে। সকাল-সন্ধ্যা ভগবানের পূজা-অর্চনা হয়। আরতি হয়। ঘন্টা বাজে, উলুধ্বনি ওঠে। আর পাঁচটা পরিচয় শুধুই জেল বা সংশোধনাগার হিসাবে। তবে এখানকার কুখ্যাত আসামীরাই আজ জেলের পরিচয়টা বদলে দিয়েছে। তারাই প্রতিষ্ঠা করেছে জগন্নাথ দেবের বিগ্রহ। নির্মাণ করেছে জগন্নাথ দেবের মন্দির। সকাল-সন্ধ্যা তারাই পূজা করে। আরতি করে। জেলের মধ্যেই দেব-দেবীরা

জেলের মধ্যেই পুজো করছে বন্দীরা।

ঘটনার মতোই এই ঘটনাও এখানকার স্বাভাবিক ঘটনা। তবে এ চিত্র কোনও মন্দির বা বসতবাড়ির নয়। চিত্রটা ওড়িশার বালাসোর জেলের। সরকারি খাতায় এর পূজা পান। ভক্তরা সানন্দে প্রসাদ বিতরণ করে। তাই বালাসোর জেলের বন্দিরা শুধুই কয়েদী নয়, তারা আজ জেলের বাসিন্দা। ঈশ্বরের নাম নিয়ে তারা নিজেরাও সুখী।

জেল কর্তৃপক্ষ একাজে 'পথের কাঁটা' হয়ে দাঁড়ায়নি। উল্টে তারাও সাহায্য করেছে। মন্দির নির্মাণে পাশে দাঁড়িয়েছে। এ জেলে বন্দির সংখ্যা কম নয়, চারশোরও বেশি। যার মধ্যে ধর্ম, ভাষা, ভক্তির পার্থক্য তো আছেই। এসবের উর্দ্ধে উঠে আজ তারা এক। সকাল হলে, সন্ধ্যা নামলে এক সঙ্গে জড়ো হয় মন্দিরে। পুজো-পাঠও তারা নিজেরাই করে। জগন্নাথ দেবের ভক্ত হিসাবে তারাও কম যায় না। পূজার সাজ - সরঞ্জামেরও কোনও অভাব নেই। যা যা দরকার তার সব কিছু নিজেরাই ব্যবস্থা করেছে। মন্দিরের ঘন্টা বাজার আওয়াজ এখানেও শোনা যায়। ভজন-কীর্তনও চলে সমান তালে।

জেলের এই চিত্র দেখে জেল কর্তৃপক্ষও গর্বিত। তাদের অনেকের মতে, এটাই তো প্রকৃত সংশোধনাগারের চিত্র। এ চিত্র ভারতের অন্য কোনও জেলে নেই, কিন্তু বালাসোরে আছে। এজন্য কম গর্বিত নন খোদ অ্যাসিস্ট্যান্ট-জেলার বিমল পান্ডে। নিজের মুখেই জেলের প্রশংসা করেন তিনি। জেলের পাশ দিয়ে যাবার সময় অনেকেই ডান হাতটা কপালে ঠেকায়। জেলের মধ্যেই মন্দির থাকায়, সাধারণ মানুষও ভক্তি ভরে প্রণাম করে। জেলের ভয়ে শতহস্ত দূরে না থেকে, আজ জেলই যেন পবিত্র মন্দিরে পরিণত হয়েছে। বালাসোর জেল যেন বালাসোর মন্দির। এসবই হয়েছে তাদের জন্য।

মালদা-মুর্শিদাবাদ সীমান্ত দিয়ে ঢুকছে জঙ্গি, অস্ত্রশস্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি।। সম্প্রতি মালদা জেলা থেকে দু'জন লস্কর-এ-তৈবার জঙ্গিকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে এক বাংলাদেশী আই এস আই এজেন্টসহ এক প্রাক্তন সেনাকর্মীকে গোয়েন্দারা গ্রেফতার করলেও জেলায় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ, চোরাকারবার, জাল টাকা ও নিষিদ্ধ সংগঠন সিমির কার্যকলাপ একটুও কমেনি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ রুখতে যতই চিরুণি তল্লাশির করার কথা বলুক না কেন, সরকার ভোট-ব্যাঙ্ক-র কথা মাথায় রেখে মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের টিকিটিও নড়াবে না। মুম্বাই জঙ্গি হামলার পর সীমান্তে বি এস এফ একটু কড়া হতেই মহদীপুর, শিরসি-কলাইবাড়ি সীমান্তে চোরাকারবারীরা গুলি চালাতে শুরু করেছে। মূলত গরু, উট এবং নেশাজাতীয় কাশির সিরাপ পাচার করতে গিয়ে বি এস এফ ও চোরাকারবারীদের মধ্যে গুলির লড়াই চলেছে। হবিপুর ব্লকের শিরসি-কলাইবাড়িতে সীমান্তের অনেকটাই কাঁটাতারের বেড়া না থাকায়, ভোরে কুয়াশার মধ্যে পাচারকারীরা গরু, উটসহ মাল পাচার করছে। গত সপ্তাহে একজন বাংলাদেশী পাচারকারীকে বি এস এফ গুলি করে মেরেছে।

হরিশচন্দ্রপুর থেকে হাজি আখতার নামে প্রাক্তন সেনা জওয়ানকে বাড়িতে জঙ্গিদের আশ্রয়দাতা হিসাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ব্যক্তি এলাকায় যথেষ্ট প্রভাবশালী। নিষিদ্ধ সংগঠন সিমির সঙ্গেও তার যোগাযোগ রয়েছে। এই হরিশচন্দ্রপুরে জঙ্গি গ্রেপ্তার হলেও মাদ্রাসা ও মসজিদে সিমির গোপন বৈঠক হচ্ছে। প্রশাসনের কোনও কড়া পদক্ষেপ নেই। বাংলাদেশী সিম কার্ডের ব্যবহার বেড়ে গেছে। এবং জঙ্গি সংগঠনগুলি সীমান্তবর্তী গ্রামগুলি থেকে দরিদ্র মুসলিম যুবকদের আই এস আই-এর জঙ্গি শিক্ষণ শিবিরে নিয়ে যাচ্ছে বলে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছে।

ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রমিক নিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশী শ্রমিক সস্তা হওয়ায় কালিয়াচক, হরিশচন্দ্রপুর থেকে ভারতীয় এজেন্টরা চোরাপথে শ্রমিক নিয়োগ করছে। এইসব বাংলাদেশী শ্রমিকদের মধ্যে জঙ্গিদের মিশে থাকাটা কিছু আশ্চর্যের নয়। বি এস এফের পাহারারত জোয়ানদের মাধ্যমেই এইসব এজেন্টরা বাংলাদেশ থেকে শ্রমিক আনতে পারছে বলে জানা গেছে। মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার কুভিরা-

বি এস এফের গুলিতে নিহত বাংলাদেশী গরু পাচারকারী

সবদলপুর সীমান্তে গো-পাচারের সাথে জঙ্গি ঢোকার খবর বি এস এফ পেয়েছে। কিন্তু তারা এদেশে এসে কোথায় মিশে যাচ্ছে তা জানা যায়নি। মালদা জেলার লাগোয়া পারদেওনাপুর, ধুলিয়ান, জলঙ্গি ও লালগোলা প্রভৃতি মুর্শিদাবাদ জেলা সীমান্ত দিয়েও অবাধে ঢুকছে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র। উদ্বিগ্ন প্রশাসন এবং বি এস এফ গোয়েন্দাদের মারফৎ ওই খবর শুনে তেমন কোনও পদক্ষেপ এখনও পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারেনি। মুম্বাই কান্ডের পর জলঙ্গী থেকে ফরাক্কা পর্যন্ত কাঁটাতারের বেড়াহীন দীর্ঘ ১৩৪কিমি ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে এখনও অবাধে ঢুকছে জঙ্গি, অস্ত্রশস্ত্র এর মধ্যে নদী রয়েছে, অথচ বি এস এফ এর কাছে নৌকাই একমাত্র সম্বল।

লঞ্চ বা যন্ত্রচালিত কোনও যানবাহন না থাকার জন্য এই সীমান্ত দিয়ে জঙ্গিরা এদেশে ঢুকলেও তাড়াতাড়ি বি এস এফ কোনও ব্যবস্থা নিতে পারছে না। অনেক দিন থেকে শোনা যাচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির নাগরিকদের জন্য বহুমুখী পরিচয়পত্র চালু করবে যার মাধ্যমে প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের চিহ্নিত করা যাবে। কিন্তু সেই পরিচয় পত্র তৈরির কোনও ব্যবস্থা প্রশাসন এখন করেনি। আসলে আগামী লোকসভা ভোটে মুসলিম ভোট ব্যাঙ্ক হারানোর ভয়ে সরকার, কংগ্রেস ও সিপিএম কেউই অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করবে না। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে একটু তেড়ে ফুঁড়ে উঠবে, তার পর আবার ঠাণ্ডা!

প্রশাসনের উদাসীনতায়

রায়গঞ্জে বার্ন ইউনিট বন্ধ

মহাবীর প্রসাদ টোডি ।। উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে রাষ্ট্রীয় সমবিকাশ যোজনা প্রকল্পে বার্ন ইউনিট তৈরির জন্য বরাদ্দ করা প্রায় ১০ লক্ষ টাকা দু'বছর ধরে পড়ে থাকার পর তা অন্য খাতে খরচ করা হয়েছে। ফলে বার্ন ইউনিটের কাজ বর্তমানে বিশ বাঁও জলে। অভিযোগ যে, প্রশাসনিক জটিলতা ও উদাসীনতার জেরেই ওই ঘটনা ঘটেছে। রায়গঞ্জ পুরসভা বিষয়টি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ জানিয়ে বলেছে, প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের গাফিলতি এর জন্য দায়ী। রায়গঞ্জ হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতিও এই ঘটনায় উদ্বিগ্ন।

উত্তর দিনাজপুর জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে আশ্বাস দিয়েছে যে, শীঘ্রই হাসপাতালের সার্জিক্যাল বিভাগের পাশে ৮ শয্যার বার্ন ইউনিট খোলা হবে। সম্প্রতি রোগী কল্যাণ সমিতির এক জরুরী বৈঠকে বার্ন ইউনিটের টাকা অন্য খাতে খরচ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি ধরা পড়ে। জানা গিয়েছে যে, ওই টাকা জেলায় আই ব্যাঙ্ক তৈরীর কাজে খরচ করে ফেলা হয়েছে। বর্তমানে হাসপাতালের বার্ন ইউনিট না থাকায় অগ্নিদগ্ধ রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। সার্জিক্যাল বিভাগে সাধারণ রোগীদের সঙ্গেই আগুনে পোড়া রোগীদের রাখা হচ্ছে। এর ফলে সংক্রমণের সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান মোহিত সেনগুপ্ত বলেন যে, বার্ন ইউনিটের টাকা 'আই ব্যাঙ্ক' তৈরির কাজে খরচ হয়ে যাওয়ার ঘটনা সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির চরম উদাসীনতাই প্রমাণ করছে। জেলা প্রশাসনের কাছে বার্ন ইউনিট নির্মাণের দাবি জানানো হয়েছে।

আসন ও প্রাণায়ামের মাধ্যমে মানব সেবা

সংবাদদাতা ।। আসন ও প্রাণায়াম, যোগ শিক্ষার দ্বারা মানব সেবার ব্রত গ্রহণ করেছেন মালদহ শহরের সর্বমঙ্গলা পল্লীর নিবাসী সরস্বতী শিশু মন্দিরের প্রাক্তন আচার্য এবং রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির মালদহ জেলা কার্যবাহিকা শ্রীমতী নীতা সাহা। নিজের বাসভবনেই তিনি স্থাপন করেছেন স্বামী রামদেবজীর তত্ত্বাবধানে নিঃশুল্ক মহিলা যোগ প্রশিক্ষণ সমিতি। এই সমিতির শুভ উদ্বোধন হয় ১৬ ডিসেম্বর, ০৮ তারিখে। যোগ প্রশিক্ষণ শুরু হতেনা হতেই পাড়ার ও শহরের বিভিন্ন স্থানের মা -বোনেরা ভিড় জমাতে শুরু করেছে। সেইসঙ্গে প্রত্যহ দুই বিভাগে প্রশিক্ষণ দিতে হচ্ছে।

সকলের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগানো হচ্ছে। এখানে শিক্ষিকা রূপে নিযুক্ত আছেন অনিমা বক্সি ও স্বপ্না দাশ। এছাড়াও অন্যান্য শিক্ষিকাগণ হলেন কাকলী মিশ্র, গীতা দাশ, মুক্তি মৈত্র প্রমুখ। গত ৭ জানুয়ারি থেকে ১৩ জানুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত বিশেষ যোগ শিবির সম্পন্ন হল।

এখানে বিশেষ বিশেষ রোগের জন্য মাঝে মাঝে আসছেন শহরের উমেশচন্দ্র বাস্তুহারা উচ্চ বিদ্যালয়ের (বাঁশবাড়ি) শিক্ষক তথা আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ অজিত পাঁজা। এছাড়াও যোগে বিশেষ পারদর্শী সাধন তামাং ও জ্ঞানেশ রঞ্জন বক্সি-দের কাছ থেকে নিয়মিত পরামর্শ নেওয়া হয়। রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে উঠে সকলে ভাল থাকুক, সকলে টেনশন মুক্ত হয়ে বাঁচুন, সকলের মধ্যে জাগ্রত হোক স্বদেশ প্রেম ও একতা — এই হল সমিতির ভাবনা।

সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ সর্বে
ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিদ্ দুঃখভাগ
ভবেৎ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

কৃষকরা কৃষি বিজ্ঞানীদের পরামর্শ পাবেন

সংবাদদাতা ।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কৃষকরা এখন নিজ নিজ গ্রামীণ সম্পদ কেন্দ্র থেকে উপগ্রহের মাধ্যমে দেশের সেরা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলে চাষাবাদ, বাজার, স্বাস্থ্য এবং আবহাওয়াসহ বিভিন্ন কৃষি সমস্যার সমাধান জেনে নিতে পারবেন। শিলংয়ের নর্থ ইস্টার্ণ স্পেস এপ্লিকেশন সেন্টার ও ব্যাঙ্গালোরের বিখ্যাত ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন-এর সহযোগিতায় উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চৌত্রিশটি গ্রামীণ সম্পদ কেন্দ্র স্থাপন করেছে কৃষকদের জন্য। আরও পঞ্চাশটি কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সহযোগিতা করার প্রস্তাব দিয়েছে অর্গানাইজেশন। শিলংয়ে অনুষ্ঠিত ৯৬তম ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের অঙ্গ হিসাবে গত ৫ জানুয়ারি ফার্মার্স ভার্চুয়াল কংগ্রেস থেকে অসমের দশটি গ্রামীণ সম্পদ কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত কৃষক প্রতিনিধিরা কথা বলেছে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে। এজন্য কৃষকদের সাহায্য করতে দোভাষীও ছিল।

বাঁশ-এর বদলে কোটি কোটি টাকা

সংবাদদাতা ।। কেন্দ্র সরকার ত্রিপুরাকে বাঁশ উৎপাদনে ২১ কোটি টাকা দিয়েছে। কেননা বিগত দু'বছর যাবৎ ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যেই বাঁশ গাছে ফুল দেখা দিয়েছে। সাধারণ মানুষের সংস্কার হল, এই বিরল ঘটনা আকালের ইঙ্গিতবাহী। বাঁশ গাছে ফুল-ফল হওয়ার পর গাছটি মরে যায়। ফলের বীজ খেতে ইঁদুরের দৌরাত্ম্য শুরু হয়। ইঁদুরের প্রজনন বৃদ্ধি পায়। ইঁদুর তখন বাঁশফল নয়, মানুষের খাবার খেয়ে ফেলে। ব্যাপক শস্যহানি হয়। অসম, ত্রিপুরা, মিজোরামে বাঁশের জঙ্গল ব্যাপক পরিমাণে রয়েছে।

ত্রিপুরার বনমন্ত্রী জিতেন চৌধুরী সম্প্রতি রাজ্য সচিবালয়ে জানিয়েছেন, কেন্দ্রের দেওয়া টাকা নতুন করে বাঁশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজে লাগানো হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় সবকটি রাজ্যকেই কেন্দ্র সরকার বাঁশ বাবদ অর্থ সাহায্য দিয়েছে।

কর্ণাটক

ধর্মান্তরকরণে সক্রিয় খৃস্টান মিশনারীরা

বিশেষ প্রতিনিধি।। এবার কর্ণাটকের খৃস্টান মিশনারীরা স্থির করেই ফেলেছে, সমস্ত হিন্দুকে যেকোনও মূল্যে খৃস্টান করেই ছাড়বে। গত ৪ জানুয়ারি ব্যাঙ্গালোরে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা থেকে জানা গেছে, হিন্দুরা নিজেদের বাড়িতেও নিরাপদ নয়। খৃস্টান মিশনারীরা দরজায় দরজায় গিয়ে অবৈধ উপায়ে তাদেরকে ধর্ম বিক্রি করছে। জোর করে ধর্মান্তরিত করার ঘটনা প্রকাশ্যে এল যখন প্রবোধ কুমার দাস (একজন ওড়িশাবাসী ওড়িশা থেকে এসে বসতি স্থাপন করেছেন ব্যাঙ্গালোরের মুরুগেশপল্লার পাঁচ নং মোড়ে) ছুটে গিয়ে এয়ারপোর্ট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অন্যদিকে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আসা ননজারেড্ডি কলোনির রামা রেড্ডি সহ মিকো বারবোসা ও তার স্ত্রী আসমিরা বারবোসাকে পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩(এ) ও ২৯৫(এ) ধারায় গ্রেপ্তার করে ও একটি কেস নথিভুক্ত করে।

মুরুগেশপল্লার অধিবাসীরা সবাই মিলে জড়ো হয়ে এই গুণ্ডাদের ধরে নিয়ে যায় এয়ারপোর্ট থানায়। তারা বিদেশে চাকরির লোভ দেখিয়ে সাধারণ মানুষকে খৃস্টান করার চেষ্টা করছিল। তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু বই ও হ্যাণ্ডবিল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই তিনজনের সঙ্গে যে আরও দু'জন ছিল তারা পলাতক।

গত বছর ডিসেম্বরের ২৮ তারিখে এই তিনজন মুরুগেশপাল্লার ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় বাইবেল ও অন্যান্য পুস্তিকা বিলোচ্ছিল। এই এলাকার লোকেরা প্রথমে ব্যাপারটা গুরুত্ব দেয়নি। পরে প্রবোধবাবু সহ বেশ কিছু হিন্দু-বাড়িতে ঘটনাগুলোও ব্যাঙ্গালোরবাসীর কাছে খুব অস্বাভাবিক নয়, কারণ সেখানকার রেল স্টেশন, কে এস আর টি সি-র বাস স্টপ এই সমস্ত জায়গাতে প্রায়শই এই ধরনের বইপত্র, সিডি বিকোতে দেখা যায়।

ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিল যখন গত ৪ জানুয়ারি মুরুগেশপল্লার বাসিন্দারা এই তিনজনের বারংবার ধর্মান্তরিত হতে বলায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাদের প্রলোভন আরও লোভনীয় ছিল, যখন ওরা ফর্মে সই করার বদলে অঢেল আর্থিক সুবিধা দেওয়ার কথা বলে। প্রবোধবাবু ও তাদের প্রতিবেশীরা পুলিশকে জানিয়েছেন, তারা খুবই উত্তেজিত হয়ে যান;যখন এই তিন জন বারংবার বলতে

থাকে, হিন্দু ভগবানরা কপট, তারা দারিদ্র্যের জন্য দায়ী। স্বর্গের দরজা শুধু খৃস্টানদের জন্যই খোলা, বাকিদের জন্য আছে শুধু নরক। যদি কেউ খৃস্টান হয়, তার জন্য সুবর্ণ সুযোগ থাকবে, বিদেশে মোট মাইনের চাকরি বা বসবাসের ব্যবস্থাও। জোর করে খৃস্টান করার ঘটনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠায়, হিন্দু সংগঠনগুলো রাজ্য সরকারের কাছে একটি ধর্মান্তরকরণ বিরোধী আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়েছে। ভারতীয় বুদ্ধি জীবী মঞ্চ কর্তৃক গত ৪ জানুয়ারি 'ধর্মান্তরকরণ— সত্যের উপর এক আক্রমণ' শীর্ষক এক সেমিনারে আয়োজিত হয়। ডঃ এস এল বীরাপ্পা, ডঃ এম চিদানন্দ মূর্তি, ডঃ আর গণেশ, ডঃ এন এস রাজারাম ও প্রাক্তন মন্ত্রী হরানাহল্লী রামস্বামী প্রমুখ বিশিষ্ট লেখক ও নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি অভিন্ন দেওয়ানি আইনের আর্জি জানিয়েছেন। পাশাপাশি রাজ্য সরকারের ধর্মান্তরকরণ নিষিদ্ধ করা জন্য আইন বলবৎ করার দাবিও করেছেন। বীরাপ্পা বলেছেন, হিন্দু জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে ৬.৩৫ শতাংশ হারে কমেছে, সেখানে মুসলিম জনসংখ্যা বিগত ৫০ বছরে পাল্লা দিয়ে ৩.৫৭ শতাংশ বেড়েছে। একমাত্র এই ধরনের কোনও দেওয়ানি আইনের অভাবেই এটা হয়েছে। যদি এরকম চলতে থাকে, তাহলে আগামী দেড়শো বছরের মধ্যে হিন্দুদের ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও বৈদিক জ্ঞান রক্ষা করতে ভারতমাতাকে অবশ্যই এই খৃস্টানপন্থা ও মুসলমানদের হাত থেকে বাঁচাতে হবে। এরকমটাই তিনি জনগণের সামনে বলেছেন এবং এই ধর্মান্তরকরণের বিষক্রিয়া সম্বন্ধে বুঝিয়েছেন। ঘটনাচক্রে তিনি গোটা রাজ্য জুড়ে চলতে থাকা ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগও দায়ের করেছেন।

ডঃ রাজারাম বলেছেন, ধর্মান্তরকরণকে কখনও সহজভাবে নেওয়া যাবে না। কারণ, তার সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা জড়িয়ে আছে। ধর্মান্তরকরণের বিরুদ্ধে আর একটা বড় কর্মসূচী নিয়েছে 'হিন্দু ধর্ম জাগৃতি সভা' মালেশ্বরমে তার ৪ জানুয়ারির অধিবেশনে। এই অধিবেশনে ভি এইচ পি নেতা বিজয়কুমার রেড্ডি বলেন, ধর্মান্তরকরণ ও সন্ত্রাসবাদ একই মুদ্রার দুই পিঠ। তিনি জোর গলায় পার্লামেন্ট-হামলায় অভিযুক্ত আফজল গুরুর ফাঁসীর দাবি করেছেন। আরও বলেছেন, সমস্ত রাজনৈতিক দলই তাদের ভোটব্যাঙ্কের জন্য সংখ্যালঘু তোষণ করে যাচ্ছে আর হিন্দুত্ব ভুলে যাচ্ছে।

মুম্বই কাণ্ডের পরেও গুজরাট বিলে ইউ পি এ-র বাধা

সংবাদদাতা ।। এখবর অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছিল যে, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে সন্ত্রাস দমনে মহারাষ্ট্রের মতো কঠোর আইন (মহারাষ্ট্র কন্ট্রোল অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যাক্ট) পাস করতে কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারই বাধা দিচ্ছে। আশা করা গিয়েছিল যে, মুম্বই কাণ্ডের পর গুজরাট সরকারের প্রস্তাবিত এবং রাজ্য বিধান সভায় অনুমোদিত গুজরাট কন্ট্রোল অফ্ অর্গানাইজড ক্রাইম (GUJCOC) বিল ২০০৩ আইনে পরিণত করতে কেন্দ্র আর বাধা দেবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ইউ পি এ সরকার তার আগের অবস্থানের থেকে আরও বেশি করে সতর্ক হয়েছে।

ইতিমধ্যে দু'মাস পার হয়ে গিয়েছে। সর্বশেষ খবর হল, ওই বিলে কিছু কঠোর ধারা আছে বলে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে বিলটি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরে পাঠিয়ে দিতে বলা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ভবনের এক মুখপাত্র এই খবর জানিয়েছেন।

এদিকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অফিসারদেরকে ওই বিল ফেরৎ পাঠানোর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলেছেন, পুরো বিলটাই নতুন করে খতিয়ে দেখা হবে। ওই সূত্রটি আরও জানিয়েছে — প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিলে 'বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন'-এ নতুন করে সংযোজন করেছেন। তারাই গুজরাটের ওই আইনটি আবারও ভালো করে দেখতে চান। প্রয়োজনে গুজরাট সরকারকে পুলিশী বাড়াবাড়ি হতে পারে এমন ধারাগুলো বাদ দিতে বলবেন।

উল্লেখ্য ইতিপূর্বে বিজেপি নেতা বেঙ্কাইয়া নাইডু অভিযোগ করেছিলেন যে, কেন্দ্রই রাজ্য সরকারকে সন্ত্রাস-প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করতে দিচ্ছে না। উল্টে রাজ্য এরকম কোনও আইন করতে চাইলে সেখানেও বাধা দেয়। এটা যে নিছক অভিযোগ ছিল না, কেন্দ্রের এই আচরণেই তা স্পষ্ট।

আন্দামানে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

সংবাদদাতা।। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এবার কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় শীঘ্রই শুরু হবে। গত ২০ জানুয়ারি রাজধানী নিউ দিল্লীতে দ্বীপ উন্নয়ণ আয়োগ-এর এক প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেন। তখন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ওই প্রতিনিধি মণ্ডলকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আশ্বাস দেন। এদিকে আন্দামান দ্বীপসমূহ থেকে নির্বাচিত সাংসদ মনোরঞ্জন ভক্তও তাঁর এলাকায় উন্নয়ণের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অবগত করেছেন। সকলে মিলে পর্যালোচনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, কেন্দ্র সরকার সারা দেশে বারোটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবে। তার একটি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের জন্য বরাদ্দ থাকছে।

পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করার ব্যাপারেও প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন। আবার সুনামিতে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে যারা এখনও বাসস্থানের সমস্যায় রয়েছেন তাদের জন্য অতিরিক্ত খাস জমি দেওয়ার কথাও ডঃ মনোমোহন সিং নিজেই বলেছেন। সুনামির পুনর্বাসনের কাজ দ্রুত গতিতে সম্পন্ন করা হোক তাও প্রধানমন্ত্রী চান। উন্নয়ণের কাজে কখনও টাকার অভাব হবে না বলেও তিনি জানিয়ে দিয়েছেন।

সাংসদ শ্রীভক্ত বলেছেন, আন্দামান দ্বীপসমূহ যেহেতু কেন্দ্রশাসিত অঞ্চ ল সেজন্য এলাকাটা সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে। প্রাক্তন অর্থ মন্ত্রী ও বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরমও দ্বীপসমূহের প্রশাসনকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে কোনওরকম প্রশাসনিক সমস্যা না হয়। যদি কোনও সমস্যা হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর সরাসরি হস্তক্ষেপ করবে। রাজধানীতে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের উপ-রাজ্যপাল ভূপেন্দ্র সিং, মুখ্যসচিব বিবেক রায়সহ অনেক উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

বিহারে কৃষকদের জন্য কম্যুনিটি রেডিও সেন্টার

সংবাদদাতা ।। নীতিশ কুমারের নেতৃত্বাধীন বিহার সরকার সমস্তিপুরসহ তিনটি জেলাতে কমুনিটি রেডিও সেন্টার খুলবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিহারের কৃষি সঞ্চালন এবং প্রসার প্রশিক্ষণ সংস্থানের নির্দেশক ডঃ আর কে সুহানে এই খবর দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, রাজ্যের কৃষিজাত শিল্প এবং প্রযুক্তি নিগম এই যোজনার অধীনে রাজ্যের পাটনা জেলার রাঢ়, সমস্তিপুর জেলার বিরৌলি এবং জমুই-তে সত্বর কৃষি-বিজ্ঞান কেন্দ্র চালু করা হবে। এখান থেকে বিহারের কৃষকদের কৃষি এবং পশুপালন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়মিত সরবরাহ ও সম্প্রচার করা হবে। তিনটি কেন্দ্র তৈরি করতে আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছে ৫৪ লক্ষ টাকা। বিহার সরকার প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য ইতিমধ্যেই ১৮ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা হিসেবেবরাদ্দ করেছে। শ্রীসুহানে আরও জানিয়েছেন, রেডিও স্টেশন থেকে কৃষকদের নিয়মিতভাবে আবহাওয়া, ফসল উৎপাদন, বাগান করা, মাছ-চাষ এবং পশুপালনসহ অন্যান্য অনেক বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করা হবে। কম্যুনিটি রেডিও সেন্টার এবং কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের ২০ কিমি পরিধির ক্ষেত্রে বসবাসকারী কৃষকেরা এই ব্যবস্থা থেকে সরাসরি লাভ তুলতে পারবেন।

উদ্বাস্তুদের মালিকানা স্বত্ত্ব দিচ্ছে দিল্লী কর্পোরেশন

সংবাদদাতা ।। বিজেপি পরিচালিত দিল্লীর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (এম সি ডি) ১৯৪৭ সালে আগত উদ্বাস্তুদের জমি-বাড়ির-মালিকানা দেওয়ার কথা ঘোষণা করল। দলমত নির্বিশেষে এই ঘোষণাকে স্বাগত জানানো হয়। ১০,৬১৫ জন উদ্বাস্তু এই মালিকানা পাচ্ছেন। একইসঙ্গে ওই বসতি এলাকার ৩৭৭০টি ছোট-বড় বাণিজ্যিক সংস্থা (ইউনিট)-র মালিকানাও তাদের দেওয়া হবে। ১৯৪৭-এ দেশভাগের পরে ওইসব জায়গায় ভারতে আগত উদ্বাস্তুদেরকে সাময়িকভাবে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল। দিল্লী মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এই সম্পর্কিত স্ট্যাণ্ডিং কমিটি ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। মালিকানা বদল করার কাজটা শীঘ্রই শুরু হবে এবং সেজন্য বিস্তৃত সমীক্ষাও শুরু করা হচ্ছে। বেশিরভাগ লোক, যারা ওই সব ঘর-বাড়িতে আছে তারা আর্থিকভাবে দুর্বল। কর্পোরেশন বাড়ি ভাড়াও খুবই কম নেয়। কমিশনার কে এস মেহরা জানিয়েছেন ২০০৭-০৮ এম সি ডি (মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অফ দিল্লী) বাড়িভাড়া বাবদ পেয়েছে ৪৯.৪২ লক্ষ টাকা আর খরচ করেছে ১৪১.১৬ লক্ষ টাকা। বাড়ি-ঘর, উদ্যোগ মিলিয়ে মোট পরিবারের সংখ্যাটা হল ১৪,৩৯৫টি। এতদিন ধরে উদ্বাস্তু পরিবাররা ওখানে বসবাস করলেও তাদের পুনর্বাসনের জন্য দিল্লীর কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার কোনওদিন মাথা ঘামায়নি। সুতরাং নিদেনপক্ষে যারা যেখানে আছে তাদের মালিকানা স্বত্ব দিয়ে দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত বলে জানিয়েছেন স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান বিজেন্দর গুপ্তা।

স্বস্তিকার দাম ঃ প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ঃ সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

বিষাক্ত কালনাগ আই এস আই

কিরণ শঙ্কর মৈত্র

।। পাঁচ ।।

জালালুদ্দিন ওরফে জালাল কলকাতার ক্যান্টনমেন্ট এলাকাসহ উত্তর-পূর্ব এবং বারাণসীর সামরিক সংবাদ সংগ্রহ করে পাঠাত। অক্টোবরের প্রথমেই সে উত্তরপ্রদেশের হাজিপুরে ধরা পড়ে। উর্দু, আরবি, ইংরেজি ও হিন্দিতে সে কথা বলতে

পাকিস্তানে সর্বাধিক সাহায্যপুষ্ট সন্ত্রাসী হল মাসুদ — যাকে দেওয়া হয় পুলিশী সুরক্ষা, দেওয়া হয়েছে রাজধানী ইসলামাবাদে একটি অফিস ঘর। মাসুদ অবশ্য 'জইশ-এ-মহম্মদ'-এর জায়গায় এর নতুন নাম দিয়েছে 'তেহরিক-এ-ফকরান'।

পারে। ই-মেলের মাধ্যমে সে পাকিস্তানে পাঠাচ্ছিল ক্যান্টনমেন্ট এরিয়াগুলির ম্যাপ এবং অন্যান্য সামরিক তথ্য। ফোর্ট উইলিয়াম্ ক্যান্টনমেন্ট, মেঘালয়, আইজল, গ্যাংটক ও বারাণসীর সংশ্লিষ্ট তথ্য সে ইতিমধ্যেই পাচার করেছিল। তাকে একটি সাইবার কাফেতে হাতে-নাতে ধরে ফেলা হয়, যখন সে বিশাখাপত্তনমের নৌসেনা-বসতির ম্যাপ পাঠাচ্ছিল।

মৌলানা মাসুদ আজহারকে মনে আছে — যাকে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনস ফ্লাইট ৮১৪ (ডিসেম্বর, ১৯৯৯) প্লেন হাইজ্যাকের পরে, যাত্রীদের বিনিময়ে কান্দাহারে তালিবানদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল? বলা ভালো — ভারতের বিমানযাত্রীদের বিনিময়ে। মাসুদ হল জইশ-এ-মহম্মদ সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর প্রধান, ঢত্রচ-এর অতি আদরের দুলাল। আমেরিকা ও বৃটিশ সরকার তার আর্থিক ধনসম্পত্তি, ব্যাঙ্কের টাকা-পয়সা ইত্যাদি 'ফ্রোজেন' করে দেয় (১২ই অক্টোবর)। পাকিস্তান আর কী করে? মাসুদকে বলা হল — কিছুদিন আর হৈ-চৈ না করে একটু নীচু সুরে থাকতে। কান্দাহার ঘটনার পরে মাসুদ ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করল। বুক ফুলিয়ে বলল — হ্যাঁ, জম্মু-কাশ্মীর অ্যাসেম্ব্লিতে ১ অক্টোবরের গাড়িবোমা বিস্ফোরণ আমিই করেছি। প্রকাশ্যে পাকিস্তানকে একটু লজ্জায় পড়তে হল, কারণ সে ঘোষণা করছে — আমরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। ফলে মাসুদকেও উল্টো সুরে বলতে হল — না, শ্রীনগরের ব্যাপারে আমি 'ধোয়া তুলসীপাতা'।

একটি সূত্রানুযায়ী, পাকিস্তানে সর্বাধিক সাহায্যপুষ্ট সন্ত্রাসী হল মাসুদ — যাকে দেওয়া হয় পুলিশী সুরক্ষা, দেওয়া হয়েছে রাজধানী ইসলামাবাদে একটি অফিস ঘর। মাসুদ অবশ্য 'জইশ-এ-মহম্মদ'-এর জায়গায় এর নতুন নাম দিয়েছে 'তেহরিক-এ-ফকরান'।

পাকিস্তান সবরকম চেষ্টা করছে মাসুদকে আন্তর্জাতিক বিরূপতা থেকে আড়াল করতে। ভারতের জেল থেকে তাকে মুক্ত করার জন্যে ঢত্রচ পাঁচ বছর ধরে ক্রমাগত প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের লোকেরা ১৯৯৪ সালে দিল্লীতে চারজন বিদেশিকে অপহরণ করেছিল, ১৯৯০-তে ছ'জন বিদেশী ট্যুরিস্টকে কাশ্মীরে। যাদের অবশেষে হত্যা করা হয়েছিল, যখন সরকার মাসুদকে বিনিময়ে মুক্তি দিতে রাজি হয়নি। এরপরেই ১৯৯৯ সালে কান্দাহারে বিমান অপহরণের ঘটনা। তখন বিনিময়ে সঙ্গে ওমর শেখকেও মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

কান্দাহারে মুক্তি পাবার পরেই দু'হাজার সালের জানুয়ারি মাসে মাসুদ জইশ-এ-মহম্মদ প্রতিষ্ঠা করে। তাকে প্রচুর আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য দেয় আই এস আই। মাসুদকে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের শীর্ষ নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল আই এস আই।

অবশেষে আমেরিকা সরাসরিভাবে পাকিস্তানকে দায়ী করেছে জম্মু-কাশ্মীরে অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মের জন্যে।

আবদুর রহমান গিলানি

আফজল গুরু

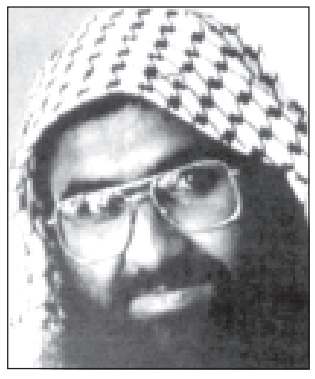

মাসুদ আজহার

আমেরিকা কর্তৃপক্ষ 'দ্য ন্যুয়র্ক টাইমস্'-কে বলেন, পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা ঢত্রচ এমন কী আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীদের আমেরিকার ইন্টেলিজেন্স আল-কায়দা ক্যাম্পে ঢত্রচ-সমর্থিত হরকত-উল-মুজাহিদিন সন্ত্রাসবাদীদের দেখতে পেয়েছে। ১৯৯৮ সালের আগস্ট মাসে আমেরিকা যখন আফগানিস্তান ঘোস্তক-এর কাছে আল-কায়েদার বিরুদ্ধে ক্রুইজ মিসাইল আক্রমণ করে, তখনই ওসামা বিন লাদেনের ক্যাম্পে, ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদীদের ট্রেনিং-এর জন্যে ঢত্রচ-এর নির্ভরশীলতার কথা জানা যায়।

১৩ ডিসেম্বর (২০০১) ভারতীয় পার্লামেন্টের উপরে যে আত্মঘাতী আক্রমণ করা হয় তার পেছনে ছিল জইশ-এ-মহম্মদ ও লস্কর-এ-তইবা-র যুগ্ম প্রয়াস। এর সঙ্গে জড়িত ছিল দিল্লী ইউনিভার্সিটির লেকচারার সৈয়দ আবদুর রহমান গিলানি। সন্ত্রাসবাদীদের সে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিল — এ কথা জানান তখনকার পুলিশ কমিশনার অজয়রাজ শর্মা (১৬ ডিসেম্বর)। এই অন্তর্ঘাতের সঙ্গে জড়িত পাঁচজন, সেই মহম্মদ যে হাইজাক করা ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমানে কান্দাহারে অন্যতম যাত্রী রূপেন কাতিয়ালকে হত্যা করেছিল। রূপেন সস্ত্রীক হানিমুনে যাচ্ছিল।

ভারতীয় পার্লামেন্টে এই আত্মঘাতী হামলায় হামলাকারীরা সবাই মারা গিয়েছিল, নিহত হয়েছিল আরও ৮ জন এবং আহত ১৬ জন। জইশ-এর কম্যাণ্ডার গাজি বাবা ওরফে ডক্টর-এর নির্দেশে তারা নভেম্বর থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছিল। জাকির হোসেন কলেজের (সান্ধ্যকালীন) অ্যারাবিক লেকচারার-এর উপরে পুলিশ কয়েকদিন নজর রাখবার পরে গ্রেপ্তার করে ১৫ ডিসেম্বর। গ্রেপ্তারের পরে গিলানি জানায় যে মহম্মদ আফজল ও শওকতহুসেন নামে আরও দু'জন আক্রমণের পরিকল্পনায় জড়িত। আফজল হল জইশ-এর কো-অর্ডিনেটর। সুইসাইড স্কোয়াডের পাঁচজনকে সে শ্রীনগর থেকে এনে দিল্লীতে জড়ো করেছিল। সবাইকে জায়গা দেওয়া হয়েছিল মুখার্জি নগরে।

শওকত ও আফজল একটি ট্রাকে করে আক্রমণের দিনেই শ্রীনগর চলে গিয়েছিল। পরে শ্রীনগর পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে। এদের কাছে ছিল একটি ল্যাপটপ এবং ১০ লাখ টাকা।

পুলিশী অনুসন্ধানে আরও অনেক চাঞ্চ ল্যকর তথ্য প্রকাশ পায়। ২০০১ সালের ফেব্রুয়ারিতে কাশ্মীরের সোপোর অধিবাসী মহম্মদ আফজল, গাজিবাবার সঙ্গে দেখা করে। আফজল জানায় যে ঢত্রচ-এর সঙ্গে জইশের মুরুব্বি মাসুদ আজহার এবং লস্করের নেতা জাকি-উর-রহমান একসঙ্গে হাত মিলিয়েছে। গাজি বাবা আজহারকে বলে যে ঢত্রচ-একটা বড়সড় ফিদাইন (আত্মঘাতী) আক্রমণ চালাতে বলেছে যাতে সবার টনক নড়ে যায়।

আফজল তার বন্ধু আবদুর রহমান গিলানি এবং কাদির শওকতকে প্ল্যানের কথা বলে। অক্টোবরে সে যখন শ্রীনগর যায় গাজিবাবা তাকে মহম্মদ নামে এক পাকিস্তানীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় —

মহম্মদ ও আফজল দিল্লী আসে। সোজা চলে যায় তাদের নিরাপদ আবাস মুখার্জি নগরের খৃস্টান কলোনিতে।

এক সপ্তাহ পরে, আফজল শ্রীনগর যায় এবং ফিরে আসে দু'জন জইশ সন্ত্রাসবাদী রাজা ও হায়দারকে সঙ্গে নিয়ে। এবার সে তাদের গান্ধী বিহারে অন্য একটি বাড়িতে নিয়ে যায়।

এক সপ্তাহ পরে আফজল যখন শ্রীনগরে যায় তার সঙ্গে আরও দু'জন ফিদাইন, রানা ও হাম্জা-ও আসে। এরা সবাই পাকিস্তানী।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শওকতের বাড়িতে একটি মিটিং হয়, প্ল্যানের অন্তিম রূপ দেবার জন্যে। পার্লামেন্টের চারদিকে পর্যবেক্ষণের জন্যে তারা একটি মোটর সাইকেল কেনে। তারা আরও কেনে সেল ফোন, জামাকাপড়, পুলিশের ইউনিফর্ম, ব্যাগ ইত্যাদি। ১১ ডিসেম্বর একটি অ্যাম্বাসাডার কার কিনে কাঁচগুলি রঙিন করে, তাতে ভুয়া স্টিকার এবং একটি রেজ বেকন লাগানো হয়।

১৩ ডিসেম্বর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা পার্লামেন্টের দিকে যায়। পথে সেল ফোনে তারা আফজলকে বলে টি ভি-তে পার্লামেন্টের দৃশ্য দেখবার জন্যে এবং সেখানে উপস্থিত দ্দঢত্ন-দের কথা জানাবার জন্যে। আফজলের অবশ্য তাদের আর ফোন করবার সুযোগ হয়নি। কিন্তু ঢত্রচ-এর নির্দেশে যে-ভয়ানক হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল তা টি ভি এবং খবরের কাগজে বিশদভাবে প্রকাশিত হয়।

।। ছয় ।।

পাক-ভারত মৈত্রী-প্রতীক 'সমঝোতা এক্সপ্রেস' থেকে ২৬ ডিসেম্বর একজন সওয়ারিকে গ্রেপ্তার করা হয় যার কাছে নিষিদ্ধ দ্রব্যাদি এবং ম্যাপ, 'ক্লাসিফায়েড' ইন্ডিয়ান আর্মি ডকুমেন্ট ইত্যাদি সময়াউদ্দিন নামে আই এস আই-আনুকূল্য লব্ধ মুজাফ্ফর নগর-নিবাসী এই ব্যক্তিকে দরিয়াগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করা হয় যখন সে লাহোরে টেলিফোনে কথা বলছিল। সে স্বীকার করে ভারত-পাকিস্তানে সে এপর্যন্ত এগারো বার যাতায়াত করেছে।

সমঝোতা এক্সপ্রেসকে কেউ কেউ 'জাল-নোট এক্সপ্রেস'ও বলেন। ট্রেনটি সপ্তাহে দু'দিন দিল্লী-লাহোরের মধ্যে যাতায়াত করে।

গোপন সূত্রানুসারে আই এস আই - এজেন্টরা সওয়ারিদের বেছে নিয়ে নিজেদের দুষ্কর্মে ব্যবহার করে। কেউ কেউ পাক প্রোপ্যাগান্ডায় প্রলুব্ধ, কেউ ত্বরিতে অতিরিক্ত উপার্জনের আশায়। পাকিস্তান মিশন থেকে ভিসা পাবার পরেই আই এস

কান্দাহারে মুক্তি পাবার পরেই দু'হাজার সালের জানুয়ারি মাসে মাসুদ জইশ-এ-মহম্মদ প্রতিষ্ঠা করে। তাকে প্রচুর আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য দেয় আই এস আই। মাসুদকে কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের শীর্ষ নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল আই এস আই।

আই এজেন্টরা তৎপর হয়ে ওঠে, পাকিস্তানগামী সওয়ারিকে তারা দু'একটা প্যাকেট দেয় নিয়ে যাবার জন্যে। আবার পাকিস্তান থেকে ফিরবার সময়ে কিছু জিনিষপত্র নিয়ে আসার জন্যে।

উত্তর-পূর্ব দিল্লীর খাজুরি খাসের শাহজাহান নামে এক মহিলাকে রফিক নামে এক ব্যক্তি এসে বলে যে তার পাকিস্তানে যাবার টিকিট এবং সেই সঙ্গে এক হাজার টাকা দেওয়া হবে। বিনিময়ে তাকে কাপড়ের একটি ব্যাগ লাহোরে নেমে শামিম নামে ব্যক্তিকে দিতে হবে। লাহোরে শামিম ব্যাগটি নিয়ে তাকে আরেকটি ব্যাগ দেয় রফিককে দেবার জন্যে। পুলিশ রফিককে গ্রেপ্তার করে ব্যাগের মধ্যে ৩.৫ লাখ টাকার জালনোট পেয়ে যায়।

আই এস আই এজেন্টরা অভিজ্ঞ যাত্রীদের মাধ্যমে আর ডি এক্স ও মাদক দ্রব্য আমদানি করে ভারতে। সাধারণ যাত্রীরা সন্দেহ সৃষ্টি করে না বলে, তাদের মাধ্যমেও আপত্তিকর জিনিষপত্রের আনাগোনা চলে। অনেকে জানতেই পারে না যে তারা নিষিদ্ধ কিছু নিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান থেকে আমদানি করা দ্রব্যাদির মধ্যে রয়েছে চীনা সিল্ক, শুকনো ফল, জাল নোট, আর ডি এক্স, মাদক বস্তু ইত্যাদি এবং ভারত থেকে নিয়ে যাওয়া হয় পান পাতা, নারকেল তেল, স্টিলের আসবাবপত্র।

আফগানিস্তান নতুন অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবার পরে খোলাখুলিভাবে আই এস আই-এর সঙ্গে ওসামা বিন লাদেনের সংযোগ এবং আই এস আই-এর ভারত বিরোধী কাজকর্ম ও সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মের কথা মুক্ত কণ্ঠে বলতে শুরু করে। ৩০ ডিসেম্বর তারা আফগানিস্তান-পাক সীমান্তে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষক সৈন্যদলকে মোতায়েন করেন যাতে আই এস আই লাদেনকে সাহায্য করতে না পারে।

আফগানিস্তানের সীমান্ত সংক্রান্ত মন্ত্রী আমানুল্লাহ বলেন — তিনি তার লোকজন সীমান্তে পাঠিয়েছেন আই এস আই-এর সন্দেহপূর্ণ কাজকর্ম ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্যে।

২৯ ডিসেম্বর ইরানিয়ান টেলিভিশনে অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী ইউনুস কোয়ানুনি একটি সাক্ষাৎকারে সোজাসুজি আই এস আই-কে

(এরপর ১৫ পাতায়)

কীসের টানে বইমেলায়

শিবাশিস্ দণ্ড

ময়দানের বইমেলা তথা কলকাতার প্রাণকেন্দ্রের বইমেলাকে এক ঠ্যালায় সল্ট লেকে পাঠিয়ে দিয়ে লাভ না ক্ষতি, সুবিধা না অসুবিধা — এই বিতর্কের আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়া আমার অভিপ্রায় নয়। মহানগরীর বক্ষস্থল থেকে পুস্তকমেলা অপসৃত, বহিষ্কৃত না নির্বাসিত — নিন্দুকেরা এই নিয়ে যা বলছেন বলুন : ওই পথে নয়, আমি হাঁটবো অন্য পথে। বইমেলার বিচিত্র আসরে দ্বাদশ দিবস ধরে মেতে থাকার আবেগের বেগ— দূরত্বের কারণে কিঞ্চি ৎ বিঘ্নিত হলেও, বইমেলা নিয়ে বঙ্গবাসীর যে বিস্তর উৎসাহ-উদ্দীপনা এখনও অটল-অটুট তা কীসের টানে? ইলেকট্রনিক মিডিয়ার রিয়ালিটি শো আর রকমারি বিনোদনে দেশ-দুনিয়া যখন হাবুডুবু, ন্যানো টেকনোলজির নবদিগন্ত উন্মোচনের সাথে সাথে মহাকাশের গ্রহ নক্ষত্র যখন আরও নিকটতর — এই যুগসন্ধিক্ষণে কষ্টসাধ্য জ্ঞান উপার্জনের উপাদান 'বই' নিয়ে হইচই করার মূল কারণটি কি? 'বই' নাকি 'বইমেলা', নাকি শুধু 'মেলা'— বঙ্গবাসীর উৎসাহের উৎসটি কোথায়, এই নিয়েই বরং আলোচনা করা যাক। বইমেলায় কেউ যান দেখতে, কেউ যান ঘুরতে, কেউ যান বেচতে, কেউ যান কিনতে। সেই বিচারে সমস্ত ধরনের বইমেলা প্রেমীদের ভাগ করা যেতে পারে প্রধানত ৩টি ভাগে :

১. 'বইয়ের টানে বইপোকারা :—

নানাবিধ নেশা আসক্তির মতো বইয়ের নেশায় নেশাগ্রস্ত কিছু মানুষ ফুটপাত হোক বা বইয়ের দোকান, লাইব্রেরী হোক বা বইমেলা —নিয়মিত ছুটে বেড়ান বই সংগ্রহের তাগিদে। চুলোয় যাক ঘর-সংসার; তিতিবিরক্ত গৃহিণীর নিত্য খিঁচুনি উপেক্ষা করেও বইয়ের জন্য ছোটা চাই। বৈঠকখানা থেকে শোবার ঘর যত্রতত্র বইয়ের স্তুপ। তারই মধ্যে বসে চলে জ্ঞানের সাধনা। নিভৃতে গিন্নীকে ভালো মুডে পেয়ে গেলে এরাই বলেন — 'নতুন বইগুলো কোথায় রাখি বলো তো? রান্নাঘরের ওপরের তাকে স্লাইডিং ডোর বসিয়ে নিলে হয় না?' গিন্নী মুখ ঝামটা দিয়ে বলেন — 'আমার মরণ'। বইমেলার আসরে এই গোত্রীয়দের আনাগোনা চুপিচুপি। হরেক রকম বই দেখো, নতুন বইয়ের গন্ধ নাও প্রাণ ভরে, যথাসাধ্য বই কেনো, কাঁধের ঝোলা বোঝাই করে বাড়ি ফেরো।

২. 'বইমেলা'-র টানে হালে পানি না পাওয়া সাহিত্যসেবীরা ঃ—

অনেকেই আছেন অনেক বছর ধরে লিখছেন। স্বউদ্যোগে স্বখরচায় স্বরচিত কিছু চটি বই বা স্বসম্পাদিত পত্রিকা নিয়ে বইমেলায় হাজির হন। নিন্দুকেরা বলে এদের পুস্তিকা-পত্রিকা পোকায় কাটে, বাজারে কাটে না। এই গোত্রের হালে পানি না পাওয়া সাহিত্যসেবীরা তক্কে তক্কে থাকেন— বইমেলা এলেই বুকে, পিঠে পোস্টার সাঁটিয়ে ছড়া কবিতা জোক্স-এর চটি বই নিয়ে হকারি করেন। এরা ক্রেতা নয়, বিক্রেতা। মেলা শেষে হিসেব কষেন আমদানি যা হল, তাতে নতুন কোনও চমকে-চটকে পরবর্তী বইটা ছাপানো যায় কিনা!

৩. মেলার টানে বাউল বাউন্ডুলেরা :

ব্যাঞ্জো-গিটারে ঢোলে নালে ব্যান্ড সঙ্গীতের আসর জমিয়ে দেয় এক একটা দল। নতুন যৌবনের দূত এরা। কবিতা লেখে, গান গায়, প্রাণের স্ফূর্তিতে মেতে থাকে ভরপুর। সোচ্চার প্রতিবাদীও হয়ে ওঠে কখনও। 'বই' নয়, বই কিনতে বা দেখতে আসা 'লোকজন'-ই হল এদের লক্ষ্য বা টার্গেট।

এছাড়াও বইমেলার দুর্নিবার টানে ভেসে বেড়ান অনেক ভাসমান ক্রেতা। এরা 'চর্মজ মেলা'-য় গেলে মানি পার্স বা বেল্ট কেনেন। শিল্পমেলায় গেলে এফ এম রেডিও কেনেন। হস্তশিল্প মেলায় গেলে পোড়ামাটির ফুলদানি বা মাদুরকাঠির দেওয়াল চিত্র কেনেন, চড়ক মেলা আর মকরমেলায় গেলে কাঠিগজা, বাদাম পাটালি কেনেন। আর, মেলাটি যদি বইয়ের মেলা হয়, তবে রহস্য-রোমাঞ্চ , ঠাকুর-দেবতা বা গল্প-উপন্যাসের বই কেনেন।

জীবনে প্রথমবার কলকাতার বইমেলায় ঘুরে গিয়ে এক প্রবাসী পত্রবন্ধু আমাকে লিখলেন — 'আরেববাস! তোদের বইমেলায় তেলেভাজার স্টলে যা লম্বা লাইন দেখলাম না, আমি তো অবাক!' তবে হ্যাঁ, বেগুনিগুলোর পেল্লাই সাইজ দেখে আমারও মন গলে গেছে!'

রসিক বন্ধুটি অবাক হলেও এই দৃশ্যে আমি অন্তত হতবাক হতে রাজি নই। কারণ, বঙ্গদেশে তেলেভাজার জনপ্রিয়তা যে তুঙ্গে — একথা মানতে কোনও দ্বিধা নেই। তাই পত্রোত্ত রে বন্ধুকে লিখলাম — 'যতদিন না তেলেভাজার মেলায় গিয়ে বইয়ের স্টলে লম্বা লাইন

(ফাইলচিত্র)

দেখছো, ততদিন হতাশ হওয়ার কিছু নেই।' সত্যি কথা বলতে কি, বইমেলায় শুধু বই নিয়ে হইচই হবে, এমন গোঁড়ামি বোধহয় তাবড় তাবড় বইপোকাদেরও আজ নেই। বরং বইমেলার উৎসবকে ঘিরে দানা বেঁধে ওঠা আশা-প্রত্যাশার লুকোচুরিগুলো একতু তলিয়ে ভাবলেই সহজ-সরল হয়ে যায়। তেলেভাজার জনপ্রিয়তা বইয়ের জনপ্রিয়তাকে হার মানাচ্ছে — এই আশংকাও বিলকুল উধাও হয়ে যায়। একবার ভাবুন তো — বছরভর ডাইরিবন্দি অনুভূতিগুলোকে স্বখরচায় ছাপিয়ে স্ব-উদ্যোগে বিপণনের এমন ভরা হাট আর কোথায় পাওয়া যাবে? কোথায় পাবেন কলেজে গোঁত্তা খাওয়া প্রেমটাকে রিনিউ করে নেওয়ার এমন সুবর্ণ সুযোগ? কিংবা গান পাগলদের আড্ড ায় বসে নতুন গানের কলিতে কণ্ঠমেলানোর এমন মুক্তমঞ্চ ? কিংবা স্বপ্নের চেয়েও প্রিয় লেখক-কবিদের ছুঁয়ে দেখার এমন বিরল অবকাশ? নাটক থেকে ম্যাজিক, চিত্রকলা থেকে খেলাধূলা, সঙ্গীত থেকে সংবাদপত্র, রাজনীতি থেকে রূপালি পর্দার ছোট-বড়-মাঝারি তারকাদের এক আঙ্গিনায় ফুরফুরে ঘরেলু মেজাজে হাতের নাগালে পাওয়া— এ সবকিছুই তো বইমেলার দান, সুপার বাম্পার গোল্ডেন অফার!

তাই তো, সাধের বইমেলাকে ঘিরে দানা বেঁধে ওঠে বঙ্গবাসীর স্বপ্ন। এই নিয়ে নানা স্তরে কত না প্রস্তুতিপর্ব! বই-বইপোকা আর মেলা পাগলদের জমজমাট হট্টমেলায় কটা দিন আগলছাড়া আনন্দ। বিচিত্রতার সহাবস্থানের এই মুক্তমঞ্চ থেকেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বঙ্গদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি-অর্থনীতি-বিজ্ঞান প্রযুক্তির হাল হকিকৎ। তাই, তেলেভোজা বেগুনির স্টলে লাইন যতোই লম্বা হোক না কেন, উৎসাহ আবেগ স্বপ্ন আর প্রাণপ্রাচুর্য্যে ভরপুর। আপামর বাঙালীর 'বইমেলা' পড়ুয়া অপড়ুয়াদের মনখোলা মেলামেশার উৎসব হিসেবে আজও অমলিন।

বই কেনা ও বই পড়া

নবকুমার ভট্টাচার্য

একটা সময় ছিল যখন লেখকের হাতে লেখা পুঁথি হাতে হাতে নকল হয়ে পাঠকের কাছে পৌঁছতো। ছাপাখানা আসার পর নকল-নবিশের দিন গেল। কিন্তু বই ছাপাতে গেলে টাকার প্রয়োজন। কোনও লেখকের টাকা ছিল, কারোর বা তা ছিল না। তবু বই তো ছাপাতে হবে। প্রয়োজন দেখা দিল পৃষ্ঠপোষকের। উনিশ শতকে বাংলা বইয়ের পৃষ্ঠপোষকতা হয়েছে কয়েকরকম ভাবে। ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতা, সমষ্টিগত পৃষ্ঠপোষকতা, প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা, রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতা।

প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতা দেখা যেত দু'ভাবে লেখক নিজের খরচে বই প্রকাশ করার পূর্বেই কোনও প্রতিষ্ঠান কয়েক'শো কপি বই কিনবেন বলে আগাম প্রতিশ্রুতি দিতেন বা বই প্রকাশ হবার পর বেশ কিছু কপি কিনে নিতেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ নিজেরা বই প্রকাশ করত না। লেখকদের বই কয়েকশো কপি কিনে নিত। যেমন ১৮০২ সালের ফস্টারের দ্বি-ভাষিক অভিধানের ২য় খন্ড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১০০ কপি কিনে নিয়েছিল। ১৮১০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ মোহন প্রসাদ ঠাকুর একটি দ্বি-ভাষিক অভিধান সঙ্কলন করেন।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির তরফ থেকে এই অভিধানও ১০০ কপি কেনা হয়।

পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অবদান রয়েছে। তারা গ্রন্থের রচনাগত উৎকর্ষ ও লেখকের শ্রমের পুরস্কার হিসেবে অর্থানুকূল্যে কার্পণ্য করেনি। 'দি ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' (১৮০৩) ও বঙ্গদর্শন (১৮২৬) তাদের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮০১ সালে রামরাম বসু লেখেন 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং ১৮০২ সালে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার লেখেন 'বত্রিশ সিংহাসন'। উভয়েই পুরস্কারের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেন। উইলিয়ম কেরি দু'জনের জন্য যথাক্রমে ৬০০ টাকা ও ৪০০ টাকা পুরস্কারের সুপারিশ করলেও, তাঁরা পেয়েছিলেন ৪০০ টাকা ও ২০০ টাকা। কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজে ব্যবহারের জন্য কিনেছিলেন, হিতোপদেশ (গোলকনাথ) ৮ টাকা করে ১০০ কপি, বেতাল পঞ্চ বিংশতি (বিদ্যাসাগর) ৩ টাকা করে ১০০ কপি। স্কুল বুক সোসাইটি দেশীয় লেখকদের দিয়ে বহু বই লিখিয়েছে। এদিক থেকে তারাই প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশক। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অভিধানটি (১৮১৭) তারা দু'বারে ২০০ কপি করে মোট ৪০০ কপি বিতরণের জন্য কিনেছিল।

স্কুল বুক সোসাইটির পর হিন্দু কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং তত্ত্ববোধিনী সভা তাদের পাঠশালার জন্য লেখকদের দিয়ে বই লিখিয়েছেন, বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতার বহু নজির রয়েছে। উনিশ শতকেও সে ধারা বজায় ছিল। লেখকরা গ্রন্থের আখ্যাপত্রে এবং ভূমিকায় সশ্রদ্ধ নামোল্লেখ করতেন। সে সময় 'অনুমত্যানুসারে', 'আদেশ', 'আনুকূল্যে' — শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। বিদ্যাসাগর 'বেতাল পঞ্চ বিংশতি' লিখেছেন মার্শালের আদেশানুসারে, 'কথামালা' লিখেছেন গর্ডন ইয়ং-এর অভিপ্রায়ানুসারে।

ব্যক্তি যখন সমষ্টি হয়ে বই প্রকাশের পূর্বেই তা কেনার লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন, তখন তিনি 'গ্রাহক'। সেকালে বই প্রকাশের পূর্বে আগাম টাকা নেওয়ার ব্যাপার ছিল না, টাকা ছাড়াই 'নাম সহি' দিতে হত। বই প্রকাশের পর প্রথম প্রথম তাঁদের বাড়িতেই বই পাঠানো হত এবং গ্রাহকদের নাম প্রথমদিকে কিছু কিছু বইতে ছাপাও হত। যেমন ফস্টারের দ্বি-ভাষিক অভিধানে ২৭৫ জন গ্রাহকের নাম ছাপা হয়েছিল। এর মধ্যে এদেশীয় মাত্র ছ'জন — গোপীমোহন ঠাকুর, নীলমণি হালদার, প্রীতরাম দাস, রসিকলাল বাবু, শ্যামসুন্দর ধর, শম্ভুনাথ রায়। ১৮২১ সালে বইয়ের গ্রাহক চাওয়া হয়েছিল বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এই ভাবে — 'যে ব্যক্তি সহি করিবেন তিনি পঞ্চ াশ টাকাতে পাইবেন তদ্ভিন্ন সত্তরি টাকা লাগিবেক।' ১৮২৭ সালে আমড়াতলার বেণীমাধব দত্ত বিজ্ঞাপনে 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থ সম্বন্ধে জানাচ্ছেন — বইটি ৮৬৮ পৃষ্ঠার, দাম ১০ টাকা। তুলাত কাগজে উত্তমাক্ষরে ছাপাইবে। গ্রন্থ প্রেরণ করিয়া ওই নিরূপিত মূল্য লওয়া যাইবেক। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'শ্রীমদ্ভাগবত' ছাপিয়েছেন ব্রাহ্মণ কম্পোজিটার দিয়ে তুলট কাগজে। গ্রাহকমূল্য ৩২ টাকা। সাধারণ মূল্য ৫০ টাকা। আরও বলেছেন, কলকাতা থেকে ১০ ক্রোশের বেশি দূর হলে বই পাঠানোর খরচ আলাদা।

এত করেও কি পাঠককে বই কেনানো যেত? ১৮৭১ সালে এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় স্কুল বুক সোসাইটির নিয়ম ছিল একসঙ্গে বেশি বই কিনলে শতকরা ১৫ টাকা হারে কমিশন পাওয়া যাবে। পাঠককে শুধু কমিশন দিলেই চলবে না। লেখককে তাঁর গুরুত্ব কত পাঠক সেটাও দেখে। ১৮১৭ তে 'শব্দসিন্ধু'র গ্রন্থকার পদ্যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন —

উত্তরপাড়া গ্রামবাসী বিপ্রবংশে জাত।
অকিঞ্চ ন পীতাম্বর মুখুটীতে খ্যাত।।
সুরগুরু তুল্য বৃদ্ধি স্থিতি দিবা গ্রাম
শ্রীতর্কভূষণে খ্যাত চণ্ডীবর নাম।
তথা মাম তাতানুজ বাস নিজ ধাম।
খ্যাত বিদ্যাভূষণে শ্রীযুত শিবরাম।।

পাঠককে বইয়ের কথা জানাতে, বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাই প্রচার। প্রচার অর্থে বিজ্ঞাপন। সবচেয়ে পুরাতন যে বিজ্ঞাপনটি আমাদের চোখে পড়ে— সেটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৯২ সালের ১৯ মার্চ 'ক্যালকাটা ক্রনিকল' পত্রিকায়। বইটি আপজনের দ্বিভাষিক অভিধান।

বিজ্ঞাপনের জন্য হোক বা না হোক, বাঙালির বই কেনার অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। কারণ ছাপা বই বাঙালির এক নতুন জগৎ নতুন নেশা। বাংলা বইয়ের ক্রমবর্ধমান কদর সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠাতেও আলোচিত হয়েছে। ১৮১৯ সালের ফ্রেব্রুয়ারি সংখ্যার 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় লেখা হল — 'যেদেশে ছাপার কর্ম্ম চলিত না হইয়াছে সে দেশকে প্রকৃতরূপে সভ্য বলা যায় না। এইদেশে পূর্বকালে কতক ২ লোকের ঘরে পুস্তক ছিল এবং অল্পলোক বিদ্যাভ্যাস করিত অন্য সকল লোক অন্ধকারে থাকিত। এখন এই দেশে ক্রমে ছাপার পুস্তক প্রায় ছোট বড় সকল ঘর ব্যাপ্ত হইতেছে।'

একালের মতো সেকালেও পাঠ্য পুস্তকের দাম ছিল। পাঠককে যেসব বই দাম দিয়ে কিনতে হত এমন নয়, বিনামূল্যেও তারা বই পেতেন। স্কুল বুক সোসাইটি বহু বই বিনামূল্যে বিলিয়েছে। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে বিনে পয়সায় পাঠকের কাছে বই দান করেছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ (মহাভারত) হরচন্দ্র চৌধুরী (শেরপুর বিবরণ) খড়দহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস এর ৮টি বই বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন।

বাঙালির বইয়ের পিপাসা আজও মেটেনি। মুজতবা আলি বই সম্বন্ধে বলেছেন 'বই সস্তা নয় বলে লোকে বই কেনে না, আর লোকে বই কেনে না বলে বই সস্তা করা যায় না।'

ক্ষুদিরাম সন্ত্রাসবাদী ?

শহীদ ক্ষুদিরামকে 'সন্ত্রাসবাদী' আখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্পর্কে দু-চার কথা ।

নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরে নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটানোর পর যে সরকার বিপ্লবী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীকে সন্ত্রাসবাদী বলতে পারে তারা যে সকলেই এক এক জন পাগল — একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ক্ষমতা, অর্থ ও মদগর্বের অহঙ্কারে এরা হয়কে নয় করতে যে কত ভালো পারে তার কয়েকটা ছোট উদাহরণ ইতিমধ্যেই দেখেছি। বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী ক্ষুদিরাম এবং আরও অনেকে যারা স্বাধীনতা এনেছিলেন, তাদেরই অর্জিত ক্ষমতার আসনে উপবেশন করে মৌরসী পাট্টা করে স্বাধীনতার প্রাক্কালে বলেছিল 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়'। এখন ঢং করে জন্মদিন পালন করলেও যে নেতাজীকে তোজোর কুকর বলতেও এদের জিভে জড়তা আসেনি। এরা বিশ্বকবিকে বুর্জোয়া কবি বলে এখন আবার ঘটা করে রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করে — হয় তো বা আর্থিক দিক থেকে কিছু পাবার আশায়। জগৎ বিখ্যাত সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দকে ওই একটা মিশনারী সাধু যারা বলেছিল, সমাধিস্থ থাকার সময় যারা বলেছিল রামকৃষ্ণদেবের ফিটের ব্যামো আছে, এবং শ্যামাপ্রসাদ 'সাম্প্রদায়িক', তারা কোন গ্রহের জীব কে জানে।

বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী ক্ষুদিরামের গায়ে সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে পুস্তিকা বের করতে এবং তা স্কুল পৌরসভা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বিলি করলেও সংবাদপত্রে দেখা গেছে সুস্থ ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন কিছু কিছু ক্যাডারও এর বিরূপ সমালোচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী, শ্যামাপ্রসাদ, ক্ষুদিরামের পর এবার কোন স্বাধীনতা সংগ্রামীর কপালে কী বিশেষণ আছে কে জানে। বাঘাযতীন, রাসবিহারী, বিনয়-বাদল-দীনেশ, প্রফুল্ল চাকী, রামমোহন, অরবিন্দ ঘোষ— এদের আত্মা অপেক্ষা করে থাকবে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের নিকট হতে কোনও কলঙ্কের অর্ঘ্য পাবার জন্য। দুর্জনের যে ছলের অভাব হয় না, পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

দেবু সরকার, মেমারী, বর্ধমান।

'সন্ত্রাস' আজ ভোট ব্যাঙ্ক

ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসবাদের শিকার। সত্য ও ত্রেতা যুগের সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীরা ছিল রাক্ষস। বর্তমান যুগে তাদের জঙ্গি বলা হচ্ছে। ত্রেতা যুগে সবচেয়ে বড় টেররিস্ট ছিল রাবণ। রাবণ যেমন ত্রিভুবন বিজয়ী হয়েছিল সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, বর্তমান সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীরা ত্রিভুবন দখল করতে না পারলেও, পৃথিবীর অর্ধেক তাদের সন্ত্রাসের শিকার। এই জঙ্গিরা হল মুসলিম। তাদের ত্রাণকর্তা কংগ্রেস। ইংরেজ বেশিদিন রাজত্ব করেছিল কংগ্রেস ও কমুনিস্টদের সাহায্য নিয়ে। বর্তমানে সন্ত্রাসবাদীরাও ঠিক, তাই করছে। ভোটব্যাঙ্ক অটুট যাতে থাকে তার জন্য কংগ্রেস — সিপিএমসহ বামপন্থীরা আজ সন্ত্রাসবাদকে ভারতবর্ষে স্থায়ী করতে চাইছে। ঠিক সি পি আই মুসলিম লীগের ভারত ভাগকে যেভাবে সমর্থন করেছিল এবং গান্ধীজীসহ কংগ্রেস তা অনুমোদন করেছিল। আজ আবার তারা দেশকে ভাগ করার জন্য 'ভোট ব্যাঙ্ক'-কে তোষণ দ্বারা স্থায়ী করছে।

সমর মণ্ডল, লক্ষ্মীপুর, অসম।

অনবদ্য লেখা

৬০ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, ২৮ জুলাই ২০০৮ স্বস্তিকা পত্রিকায় 'অঙ্গনা' বিভাগে লেখা "আজ সরব হয়েছে অত্যাচারিত বিধবারা" লেখাটি অনবদ্য। লেখাটির পংক্তিগুলি উল্লেখ করছি—

আমাদের হিন্দু সমাজে বিধবাদের প্রায় অচ্ছ্যুৎ করে রাখা হয় সামাজিক নানা শুভ কাজে। এক্ষেত্রে নাকি বিধবা রমণীদের মুখ দেখাও অমঙ্গল। স্বামীর অবর্তমানে সে হয়ে যায় অপাংক্তেয়। দুর্বলতার সুযোগে তারা যৌন অত্যাচারের শিকার হতে বাধ্য হয়। অভাবী সংসারে সন্তানের মুখে অন্ন তুলে নিজেরা অভুক্ত থাকেন। ফলে এরা অপুষ্টির শিকার হন। অপুষ্টি অত্যাচারের শিকার এইসব বিধবারা খুবই নিম্নমানের জীবন যাপন করতে বাধ্য হন। সংসারে এদের কোনও গুরুত্ব থাকে না। নগণ্য হিসাবেই পরিগণিত হয়। দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী জনগণ নিয়ে আলোচনা চিন্তা ভাবনা হয়ে থাকলেও, এইসব অসহায় অত্যাচারী অপুষ্ট বিধবা মহিলাদের কথা কেউ ভাবে না। তাই দাবিয়ে রাখা স্বামী হারাদের সোচ্চার হতে হবে এবং সরকারের কাছে তাদের দাবি আদায় করে দিতে হবে। সামাজিক এসব ব্যাধির বিরুদ্ধে সরব হতে হবে। যা পরবর্তীকালে একটি সমাজ কল্যাণকর সোসাইটি হিসাবে পরিগণিত হবে। এই রাজ্যেও তারা যাতে শাখা খুলতে পারে তার জন্যে অগ্রণী হতে হবে। সরকারি চাকরিতে বিধবাদের ১০ শতাংশ সংরক্ষণের দাবি তুলতে হবে।

স্বপন কুমার দত্ত, মেহের আলি মণ্ডল স্ট্রীট, কলকাতা-২৭।

কথায় ও কাজে

গত নভেম্বর মাসে সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল সরকার ৯০০ টাকা কুইন্টাল দরে চাষিদের কাছ থেকে ধান কিনবে। তার জন্য ৪টি সংস্থার নামও প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু জানুয়ারি মাসেও চাষিরা খুঁজে পেল না কোথায় ধান কেনার জন্য সরকারি সংস্থা গোলা করেছে। গড়বেতা ১ নং ব্লকে গত ১৫ অক্টোবর থেকে নতুন ধান উঠছে ও তা চাষিরা বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। কারণ সাংসারিক খরচ তো কমানো যাবে না। তার উপর পূজা-পার্বণ। ৪৫০ টাকা কুইন্টল দর ধান প্রথমে চাষিকে বিক্রি করতে হয়েছে অক্টোবরে। নুন, তেল, লংকা তো কিনতেই হবে আরও আছে নানা খরচ। আলু চাষের জন্যও খরচ আছে। তবে বীজ ও সার চাষিরা চড়া সুদে ধার নেয় মহাজনদের কাছে, তার কারণ আলু তাকেই বিক্রি করতে হবে। যারা ধার দেয় তারাই কিনবে। স্টোরে আলু রেখে কোনও লাভ চাষিরা পায়নি। ধান অবশ্য এখন বিক্রি হচ্ছে ৬৭৯ টাকাতে। চাষির ধান শেষ হতে আর বেশি দেরি নাই। পৌষ পার্বণের খরচ তো সামনে এসে গেল। তাই সরকার যা প্রচার করে কাজে তা কোনও দিন করে না। গত বৎসর যখন আলু বিক্রি হচ্ছিল না, তখন ২৫০ টাকা কুইন্টল দরে আলু কেনার কথা বললেও তার সুযোগ কোনও চাষি পায়নি ।

রবি ঘোষ, মেদিনীপুর

"অনুপ্রবেশ"

গত ৮ ডিসেম্বরের বিশেষ সংখ্যা 'অনুপ্রবেশ এক নীরব আক্রমণ' এক অভূতপূর্ব সংকলন। যা পড়ে অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে এক স্পষ্ট ধারণা প্রত্যেকের জন্মেছে। মাননীয় তথাগত রায় মহাশয়ের লেখা 'অনুপ্রবেশ ফিরে দেখা' পড়ে আমার নতুন করে কিছু ভাবনার উদ্রেক করেছি। আমি জানতে ইচ্ছুক এন ডি এ আমলে যে নাগরিকত্ব আইনের সংশোধন হয়েছে, তা বিভিন্ন লেখক দ্বারা স্বস্তিকা পত্রিকা মারফত জন সমক্ষে প্রকাশ করা হোক কারণ এই অনুপ্রবেশ নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে চরম বিভ্রান্তি আছে। বিশেষত পূর্ব বাংলা থেকে আগত জনগণের মধ্যে। আমি আরও মনে করি, ১৯৭১ সালের ইন্দিরা মুজিব চুক্তির প্রেক্ষাপট কি ছিল ? দু'দেশের জনগণের অজান্তে দু'জন দেশনায়ক তাদের কুটিল চক্রান্তে বাংলাদেশের হিন্দুদের সর্বস্বান্ত করার জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। এই বিষয়ে স্বস্তিকার পাতায় বিশিষ্ট লেখকদের দ্বারা লেখা দেখতে চাই। কারণ এই নিয়ে আমাদের দেশে এখন হাজার হাজার কোটি টাকার ব্যবসা চলছে। অত্যাচারিত হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ থেকে এসে এখানে কোনও সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। রেশন কার্ড, ভোটার লিস্ট, জাতিগত প্রমাণপত্র এমনকী ব্যাঙ্কের পাসবই পর্যন্ত তারা করতে পারছে না। কিন্তু আবার টাকার বিনিময়ে সবই হয়ে যাচ্ছে। হাজার বারশো টাকায় রেশন কার্ড এবং দুই আড়াই হাজার টাকায় ভোটার লিস্টে নাম — এটা আজ গোটা পশ্চিমবঙ্গের চিত্র। অপরদিকে মুসলিম বন্ধুরা এদেশে আসার সঙ্গে সঙ্গে রেশন কার্ড ও ভোটার তালিকায় নাম যত্নের সহিত এজেন্টগণ এখন করে থাকে, বিশেষ করে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় কোনও সমস্যায় পড়তেই হয় না বন্ধুদের। নদীয়া জেলার চাপড়ার বিধায়ক সামসুল ইসলাম মোল্লার মতো আরও অনেক মুসলিম বিধায়ক এ বিষয়ে উদার হস্ত। একদিকে বেশ কিছু অফিসার ও আমলা ৭১-এর ভয় দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করছে হিন্দু শরণার্থীদের কাছ থেকে। অপরদিকে বিনা পয়সায় মুসলিম বন্ধুদের নাম তুলে, সি পি এম ও কংগ্রেস নিজেদের ভোট ব্যাঙ্ক গড়ে তুলছে। আর মমতাদি উনি তো আরও অ্যাডভান্সড, উনার মুখে মুসলিম অনুপ্রবেশ নিয়ে কোনও কথা নাই। উনি হিন্দু শরণার্থীদের দিকে আঙুল তোলেন শক্ত করে। কবে কার নাম কাটাতে হবে সেই তালিকা ছুঁড়ে মারেন মাননীয় স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় এর উদ্দেশ্যে। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় দিদির ক্যাডাররা হিন্দু শরণার্থীদের অনেক বিব্রত করেছে।

চিঠিপত্র

প্রদীপ দত্ত, বি এস রোড, মালদা।

বেঁধো না নারীকে

প্রসঙ্গ "নিয়মের জালে বেঁধো না নারীকে" নিবন্ধ (১৭-১২-০৮)। এই দাবির যাথার্থ্য যুক্তি ও বাস্তবের মাপকাঠিতে আলোচ্য অবশ্যই। ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক উন্নতিকল্পে অনস্বীকার্যভাবে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই দায়বদ্ধ এবং আর প্রথম ও প্রধান শর্তই হল এই সমস্ত সংগঠনের নিয়ম বিধি শ্রদ্ধায় পালন। মানবসভ্যতার প্রশ্নে এই বাধ্যবাধকতার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য। সুদূর অতীতে ক্রমশ চেতনার উন্মেষের সাথে সাথে মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণায় অনুভব করেছিল যে, তার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল পরম সত্যের উপলব্ধিতে নিজেকে জাগতিক জীবনেও সার্থক করে তোলা। এই লক্ষ্য সাধনে সে সত্যিই বলি প্রদত্ত। তাই জৈবিক আবেগকে ক্রমশ নিয়মের লাগাম পরিয়ে সর্বোচ্চ পরিকল্পনার বাস্তবায়নে তার যাত্রা শুরু। কল্যাণকর পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় নিয়মের উলঙ্ঘন তাই চিরকালই শাস্তি যোগ্য অপরাধ রূপে গণ্য হয়ে এসেছে। ব্যক্তির সমষ্টিতে পরিবার বা সংসার, যার সমষ্টিতে সমাজ। প্রতিটি সংগঠনেই আবহমান কাল ধরে নারী ও পুরুষ প্রকৃতি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে গঠনমূলক ভূমকা পালন করে চলেছে। সংসারের অন্যতম প্রধান অঙ্গ হলেও পুরুষ স্বভাবে বহির্মুখী, নারী সংসারমুখী, অন্তর্মুখীও। সেখানেই এ যাবৎ শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তার আশ্বাসে নারীর সার্বিক সার্থকতার ব্যবস্থা হয়ে এসেছে। এই ব্যবস্থাকে স্বীকার করেই হিন্দু নারী প্রধানত কল্যাণময়ী মাতা ও পত্নীরূপে এ যাবৎ ত্যাগ ও সেবার পরাকাষ্ঠার আদর্শ স্থাপন করেছে, যেমন মা সারদা দেবী, রাণী রাসমণি, রাণী ভবানী, দুর্গাবতী প্রমুখ। প্রায় অসূর্যম্পশ্যা হয়েও শ্রীমা এক বিরাট সংগঠনের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপা ছিলেন। শৌর্যের সঙ্গে রাজ্য ও জমিদারি চালিয়েছেন অন্যান্যরা তথাকথিত ভাবে নিয়মের জালে বদ্ধ থেকেই, ভগ্নী নিবেদিতার কথায় শ্রীমা ছিলেন একাধারে প্রাচীনা ও আধুনিকতার সমন্বয়। পুরুষের এক প্যারোডি রূপে নারীকে ভিন্ন সত্তায় সার্থক হতে হয়নি বঞ্চনার স্লোগান তুলে। এ যাবৎ পুরুষ নিয়ম ভাঙার স্বেচ্ছাচারিতা করে এলে মানব সভ্যতাকে সূর্যালোক দেখতে হতো না। সকলেই, এমনকী "আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরে, বাঁধা সবার কাছে।" "সহস্র বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ" স্মরণীয় এক বড় উপদেশ। নিয়মের কোনও বিকল্প নেই। স্বামী বিবেকানন্দ নারীত্ব ও পবিত্রতার বিনিময়ে নারীমুক্তি সমর্থন করেননি। শৃঙ্খলমুক্তি যেমন স্বাধীনতার দ্যোতক, তেমনি যথেচ্ছাচারে ধ্বংসের পথও প্রস্তুত করে। পুরুষ প্রকৃতির কাছে আধুনিক নারী কৃতিত্বের প্রশংসনীয় স্বাক্ষর রাখলেও সামাজিক প্রয়োজনের বিচারে তা যাথার্থ্য আলোচনার বস্তু। নিয়মের বন্ধন এযাবৎ নারীর প্রতিভা স্ফূরণের অন্তরায়-এ অভিযোগ ধোপে টেকে না ইতিহাস সাক্ষ্যেই। উত্তরাধুনিক যুগে গণতান্ত্রিক কাঠামোতে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নির্বাধভোগের অধিকার পুষ্ট পুরুষ ও নারী উভয়েই। সুস্থ ও সভ্য সমাজ গঠনে অবদানের প্রশ্নে উভয়েরই হিসাব দেওয়া এই যুগেরই দাবি।

অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকেশ্বর, হুগলী।

সেবা ভারতীর প্রশিক্ষণ শিবির

সমাজ সেবা ভারতীর উদ্যোগে গত ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বাঁকুড়া সঙ্ঘ কার্যালয়ে (পাঞ্চ জন্য ভবন) অনুষ্ঠিত হল আরোগ্য মিত্র প্রশিক্ষণ বর্গ। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ থেকে ৩৮ জন শিক্ষার্থী বর্গে উপস্থিত ছিলেন। বর্গে ১০ জন বিশিষ্ট চিকিৎসক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেন।

প্রশিক্ষণ বর্গের শুভ সূচনা করেন পূর্বক্ষেত্রের সহ-ক্ষেত্র প্রচারক অজিত ভাই মহাপাত্র। দক্ষিণবঙ্গের ধর্মজাগরণ প্রমুখ অবনীভূষণ মন্ডল বর্গের বর্গাধিকারীর দায়িত্ব পালন করেন। বর্গের সমারোপ উৎসবে দীক্ষান্ত ভাষণ রাখেন সমাজ সেবা ভারতীর প্রান্তের সহ সেবা প্রমুখ দিলীপ আঢ্য। অনান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের বাঁকুড়া বিভাগ প্রচারক প্রভাতমন্ডল, জেলা প্রচারক পরিতোষ সাহা, নগর প্রচারক প্রসেনজিৎ নাথ এবং ডাঃ নরেশ চন্দ্র নাগ, ডাঃ গোপাল কর, ডাঃ গুণধর হালদার, ডাঃ আশীষ চক্রবর্তী, ডাঃ প্রবীর মুখার্জী প্রমুখ।

চক্ষু পরীক্ষা শিবির

চিকিৎসা জগতের ব্রেল পদ্ধতির স্রষ্টা মহান লুই ব্রেল-এর দ্বিশততম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে, অখিল ভারতীয় দৃষ্টিহীন কল্যাণ সঙ্ঘের পরিচালনায় গত ৪ জানুয়ারি নিঃশুল্ক চক্ষুপরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল। উত্তর ২৪ পরগণার হালিশহরে মন্তেশ্বরী মিশনারী বিদ্যালয়ে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়।

সমাবেশ সমাচার

শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণ সঙ্ঘের সর্বভারতীয় সভাপতি দিলীপ কুমার ঘোষ। স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা দৃষ্টিহীন কল্যাণ সঙ্ঘের হালিশহর শাখা প্রমুখ বাপী দাস। শিবিরে লুই ব্রেল-এর জীবনী তুলে ধরেন দৃষ্টিহীন ছবি রায়। এদিন হালিশহর পৌরসভার ২৫টি স্থান থেকে ১০৫ জন মহিলা ও পুরুষ তাদের চক্ষু পরীক্ষা করান। এদের মধ্যে ১০ জনের বিনা ব্যয়ে ছানি অপারেশন হয়।

তুলাপুনায় বালক শিবির

গত ১০ থেকে ১২ জানুয়ারি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর প্রখন্ডের বালক শিবির তুলাপুনায় অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে যোগদানকারী বালকদের সংখ্যা ছিল ৭৭ জন। শিবিরে ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯টি গ্রামের প্রতিনিধিত্ব ছিল। প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় এই শিবির অনুষ্ঠিত হওয়ায় স্থানীয় মানুষজনের উৎসাহ ছিল দেখার মতো।

হিন্দু মহাসভার প্রতিবাদ

'বুক সেলার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স গিল্ড'-এর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাল হিন্দু মহাসভা। আগামী ২৮ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা বইমেলায় গিল্ড পাকিস্তানী প্রকাশকদের আমন্ত্রণ জানায়। হিন্দু মহাসভা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গিল্ডের এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

মহাসভার মতে, এই আমন্ত্রণ পরোক্ষে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্রকে মদত দেওয়ারই সামিল। গিল্ড-এর এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বড়সড় আন্দোলনেও নামতে পারে বলে জানা গেছে। মহাসভা গিল্ডকে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য একটি চিঠিও পাঠিয়েছে।

হিন্দু মহাসভার সংগঠন সম্পাদক অনন্ত সিংহ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

বন্দে বাণী পরাবিদ্যাদায়িনী

বৈদেহীনন্দন রায়

জগতে সারবস্তুর যিনি ধাত্রী ও প্রদাত্রী, তিনিই সরস্বতী। কথাটা শুনেছিলাম এক সিদ্ধ যোগীর কাছে। জীবনে তথাকথিত বিদ্যাভ্যাসের পথে না গিয়েও তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক মহান দার্শনিক, মহান তত্ত্বজ্ঞানী। যে কোনও পার্থিব, অতিন্দ্রিয় বিষয়কে তিনি বুঝিয়ে দিতে পারতেন অতি সহজ, সাবলীলভাবে, তিনি বলেছিলেন, প্রকৃত যোগীর কোনও পড়াশুনোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনমাত্র দেবী বাগবাদিনীই তাঁর কণ্ঠে আবির্ভূত হয়ে জ্ঞানের বিচ্ছুরণে জগতকে চমকিত করে দেন।

দেবী সরস্বতী যে জ্ঞান ও সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ প্রতিমা, কালাতীতভাবে তা স্বীকৃত। স্বামী বিবেকানন্দের সাহিত্যিক বন্ধু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাঙালির পূজা-পার্বণ প্রবন্ধে দেবীকে ব্যক্ত করেছেন — "মা আমার বর্ণাত্মিকা, সপ্তবর্ণ সমন্বয়কারিণী। তাই মা শ্বেতাম্বরা, শ্বেতবর্ণা, কলেন্দু নিভাননা" — প্রভৃতি আলঙ্কারিক বাক্যে।

জ্ঞানদাত্রী এই দেবীর উক্ত রূপাভাস ঋষি মানসে কবে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল, তার সঠিক প্রমাণ আজও অধরা। তবে তাঁর বীণা পুস্তক ধারিণী মূর্তির উদ্ভব যে পুরাণের কাল থেকে, সে বিষয়ে পন্ডিতগণ অসন্দিহান।

অগ্নিপুরাণে দেখা যায় দেবী পুস্তক, অক্ষমালা ও বীণাধারিণী ও চতুর্ভুজা। আবার স্কন্দপুরাণে তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে জটা, মুকুটশোভিতা, ত্রিনয়নারূপে। বৃহদ্ধ র্মপুরাণে তিনি শুক্লবর্ণা, ত্রিনেত্রা, শশিশেখরা, চতুর্ভুজা, বিদ্যা, বরদমুদ্রা ও অক্ষমালাধারিণী — চতুর্ভুজা সুধাবিদ্যামুদ্রাক্ষ গুণধারিণী (পূর্বখন্ড, ২৫) । এই আঙ্গিকে দেবীর রূপাভাস বর্ণিত হয়েছে কবিগুরুর "পুরস্কার" কবিতায় —

বিমল মানস সরস বাসিনী
শুক্লবসনা শুভ্র হাসিনী,
বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী
কমলকুঞ্জাসনা।

পুরাণ ব্যতীত বেদেও সরস্বতীর পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। সেখানে তিনি স্ত্রী-দেবতার মধ্যে অন্য দু'জন ঊষা ও অদিতি জনমানসে হারিয়ে গেলেও, দেবী সরস্বতী কিন্তু আজও জাগরিতা ও প্রভাবান্বিতা সমভাবে। তাঁকে বিনা পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণপ্রজ্ঞা, বিদ্যাবুদ্ধি র ব্যাপকতা ও নাদসিদ্ধি যে অসম্ভব, এ বিশ্বাস জ্ঞান ও সঙ্গীতচর্চাকারীদের হৃদয়ে বদ্ধ মূল হয়ে আছে। দেখা যায় ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত অনুশীলনকারী বহু মুসলমান ওস্তাদ দেবীর মূর্তির সামনে নিত্য রেওয়াজ করতেন। আমি নিজে ওস্তাদ আমিনুদ্দিন ডাগর সাহেবকে সরস্বতী মূর্তির সামনে ছাত্রদের তালিম দিতে দেখেছি। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব তো এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন।

বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত কৃষ্ণযজুর্বেদে জ্ঞানস্বরূপা এই দেবীর পরিচয় পাই একটি সূক্তে — তিস্রো দেবীবর্হিরেদং সদত্বিড়া সরস্বতী ভারতী। অর্থাৎ ইড়া, ভারতী সরস্বতী — এই তিন দেবী যজ্ঞে আগমন করুন। সরস্বতী এখানে ত্রয়ী মূর্তি।

ঋগ্বেদে আছে দুই সরস্বতীর কথা। একজন সূর্যাগ্নির দ্যুতি, অন্যজন নদী সরস্বতী। সরস্বতী নদী তীরেই ঘটেছিল বৈদিক সভ্যতার উন্মেষ। সেখানে ছিল বৈদিক যুগের শ্রেষ্ঠ সব সাধন তীর্থ।

সরঃ বা সরস অর্থে বোঝায় জল। সরস্বতীর অর্থ যার জল আছে। বৈদিক যুগে যিনি জলপূর্ণা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদযুগে মূর্তি পূজার প্রচলন না থাকায় সস্ শব্দ জ্যোতির দ্যোতক হিসাবে কল্পিত হয়। পরবর্তীকালে অর্থাৎ পুরাণের যুগে শুক্লবর্ণা নদী সরস্বতী ও জ্যোতির্ময়ী সরস্বতীর মিলিত রূপে দেবীর উদ্ভব।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে পরমেশ্বর পরমব্রহ্মের মুখপদ্ম হতে শুক্লাবর্ণা

বীণাধারিণী, কোটি চন্দ্রের ন্যায় শোভাযুক্তা, শ্রুতি ও শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী আবির্ভূতা হন। তিনি বাক অধিষ্ঠাত্রী ও শুদ্ধ রূপা বলে সরস্বতী নামে অভিহিতা। উক্ত পুরাণে গণেশখন্ডে বলা হয়েছে তিনি কৃষ্ণ কণ্ঠোদ্ভবা। কন্যাসমা বলে কৃষ্ণ তাঁকে বৈকুণ্ঠে নারায়ণের পাণিপ্রার্থী হতে উপদেশ দেন। সঙ্গে এও বলেন দেব, দানব, মুনি, মানব সকলে মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চ মীতে তোমার পূজা করলে বিদ্যালাভে সমর্থ হবে। অন্য পুরাণ অনুসারে ঋষি কলক লুপ্ত সরস্বতীকে পুনরায় স্রোতস্বিনী করার মানসে নিধিপতি নারায়ণকে তপস্যায় তুষ্ট করে তাঁর বরে হিমালয়ে দেবীর দর্শন পান। তুষ্টাদেবী মাঘী শুক্লা পঞ্চ মীর দিন তার একটি ধারাকে পৃথিবীতে প্রবাহিত করেন। তাই ওই তিথিতে সরস্বতী পূজার বিধান। আবার শতপথ ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণযজুর্বেদীয় মতে পূজার প্রকৃষ্ট সময় হল পূর্ণিমা ও নবমী তিথি। সমগ্র ভারতে অবশ্য দেবীর আরাধনার দিন হিসাবে মাঘীশুক্লা পঞ্চ মী বা শ্রীপঞ্চ মীকে ধরা হয়। সেদিন পরা ও অপরা দুই বিদ্যা অনুশীলনকারীদের দেবী বন্দনায় মুখরিত হয়ে ওঠে এ দেশের আকাশ-বাতাস।

নেতাজী সুভাষের স্মৃতিঘেরা বামনদাস মুখার্জীর বাড়ি

সোমনাথ নন্দী

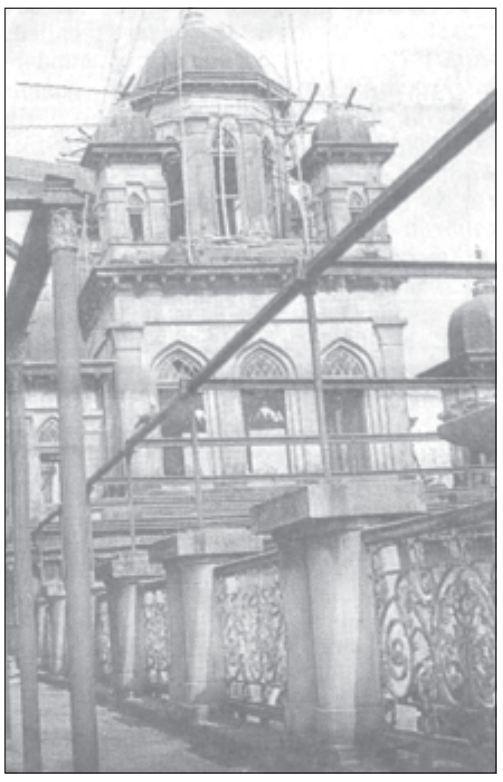

মিথ্যা জনশ্রুতি বা কল্পকাহিনী কোনওদিন কোনও ব্যক্তি, জনপদ বা ঐতিহাসিক বিষয়ের প্রকৃত পরিচয় দিতে পারে না। বিশেষত যে কাহিনীর ভিত্তি অলস, মূঢ়, ইর্ষাকাতর, প্রললভ মানুষদের মনোভূমিতে গড়ে ওঠে।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলার স্মৃতিবিজড়িত কাশীপুর উদ্যানবাটী থেকে মাত্র ১০০ গজ দূরে বামনদাস মুখার্জীর কালীবাড়ির পরিচিত না হলে কেন হবে রঘু ডাকাতের কালীবাড়ি। অথচ এই কালীবাড়িকে কেন্দ্র করে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবীদের চলত নানা আলোচনা, গুপ্ত মন্ত্রণা ও পরবর্তী অভিযানের পরিকল্পনা। সে খবর এলাকার মানুষরা কী সঠিকভাবে রেখেছেন যা বোঝার চেষ্টা করেছেন? তাঁদের তমোগুণাচ্ছন্ন মনে জগদ্দল পাথরের মতো প্রায় দেড় শতক ধরে চেপে বসে আছে উক্ত পরিচিতি। আশ্চ র্যের বিষয় তৎকালীন ইতিহাস সচেতন মানুষরা নিস্পৃহ বা উদাসীন থেকেছেন বিষয়টিতে। সম্প্রতি যদিও এ নিয়ে নাড়াচাড়া হচ্ছে।

পঁচাশি নম্বর কাশীপুর রোডের এই বাড়িটির কপালে কেন জুটল এই অদ্ভুত অভিধা, তা আজও অজানা অথচ প্রধান সড়কের ওপর পশ্চি মমুখী এই চকমিলান বাড়িটি ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে জমিদার বা সম্পন্ন ব্যবসায়ীদের আনুকূল্যে গড়ে ওঠা বিভিন্ন ঠাকুরবাড়ি বা দেবগৃহের সাথে এর মিল প্রচুর। বরাহনগরের আঞ্চ লিক ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় আঠারো-ঊনিশ শতকে এই অঞ্চ ল ছিল জঙ্গলাকীর্ণ ও দস্যু অধ্যুষিত। রেঘো ডাকাত নামে জনৈক দস্যু অঞ্চ ল দাপিয়ে বেড়াত। রেঘো ডাকাতের এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে বামনদাস মুখার্জীর এই কালীবাড়ি তথা কৃপাময়ী কালীবাড়ির পরিচিতি এলাকাবাসীর অলস মনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় রঘু ডাকাতের কালীবাড়ি।

কালীবাড়ির প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধান করলে প্রথমেই চোখে পড়বে ১৯৬৮ সালের ২০ সেপ্টেম্বর কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ রায়। ঠাকুরবাড়ি সংক্রান্ত সেই মামলায় মাননীয় বিচারপতি চন্দ্রনারায়ণ নায়েক যে রায় দেন, তাতে তিনি প্রথমেই উল্লেখ করেছেন কৃপাময়ী কালীবাড়ির প্রকৃত পরিচয়।

"শ্রীবামনদাস মুখার্জী নামে এক ধনী ব্যক্তি ১৯০৪ খৃস্টাব্দের ১৩ মার্চ, ৮৫ নং কাশীপুর রোডে একটি দেবালয় নির্মাণ করেন। উক্ত দেবালয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীশ্রী কৃপাময়ী ঠাকুরাণী (কালীমূর্তি), শ্রীশ্রী দুর্গেশ্বর ও ক্ষেত্রেশ্বর নামে দুই শিবলিঙ্গ (CWN Vol 76, Page 1016)।

ঠাকুরবাড়ি বিষয়ে অন্য সূত্র হল আজ থেকে ৮২ বছর আগে (১৩৩৩ বঙ্গাব্দে) প্রকাশিত "বংশ পরিচয়" নামে একটি গ্রন্থ। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সঙ্কলিত উক্ত পুস্তকের ৫ম খণ্ডে পাওয়া বামনদাস মুখার্জীর জীবন বৃত্তান্ত। সেখানেও বলা হয়েছে কৃপাময়ী কালী বামনদাসের প্রতিষ্ঠিত।

ঊনিশ শতকে যেসব উদ্যোগী বাঙালি ব্যবসা বাণিজ্যে কৃতিত্বের নজির রেখেছিলেন, বামনদাস মুখার্জী (১৮৪৭-১৯২১) তাঁদের অন্যতম।

বামনদাসের বংশধারায় উৎস কান্যকুব্জাগত (কনৌজ) প্রখ্যাত পন্ডিত পরিবার। উক্ত পন্ডিত বংশের প্রথম পুরুষ ছিলেন কবি শ্রীহর্ষ। তাঁর পরবর্তী পুরুষ মনুসংহিতায় টীকাকার নীলকণ্ঠ ঠাকুরের পুত্র শ্রীধরের অধস্তন সপ্তম পুরুষ ছিলেন বামনদাস। আদি নিবাস ছিল নদীয়ার ফুলিয়ায়। পরবর্তীকালে বামনদাসের প্রপিতামহ রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় চলে আসেন হুগলির গোস্বামী মালীপাড়া গ্রামে বৈবাহিক সম্বন্ধসূত্রে। তাঁর পুত্র শম্ভুচন্দ্র তিন পুত্র দুর্গাদাস,কালীদাস ও শিবদাসসহ বসবাস করতেন উক্ত গ্রামে।

ছোটবেলা থেকেই বামনদাস ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধি মান, জেদী ও স্বাধীনচেতা। বাল্যাবস্থা থেকেই তিনি জীবনযুদ্ধে র প্রতিটি স্তরকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। প্রত্যক্ষ করেছিলেন কাছের মানুষদের স্বার্থপরতা ও নগ্ন মানসিকতাকে। প্রথাগত শিক্ষায় তেমন সফল না হলেও, জোড়াসাঁকোর দাঁ পরিবারের সান্নিধ্যে থেকে তাঁর মধ্যে ব্যবসার মানসিকতা জেগে ওঠে। সেসময় তিনি ও তাঁর বিধবা মা দাঁ পরিবারের আশ্রয়ে।

প্রবেশিকা পরীক্ষার গন্ডি না পেরিয়েই, তিনি নিজ উদ্যমে শুরু করেন খেলনা ও চুনের ব্যবসা। তারপর চলে যান সুপারি ও লাক্ষার ব্যবসায়। ব্যবসাতে তাঁকে আর্থিক সহায়তা করেন কাঁসারিপাড়ায় বিখ্যাত ধনী তারকনাথ প্রামাণিক। মিতব্যয়ী ও প্রখর বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন বামনদাস এ সময় ৯৭ নং বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে সাড়ে ৩ কাঠা জমি কিনে তৈরি করেন একটি নিজস্ব বাড়ি।

এরপর বামনদাস ব্যবসাকে বহুমুখী করে তোলেন। সীতারামপুরে তিনি একটি কয়লাখনি ইজারা নেন। খনির উচ্চমানের কয়লা তাঁকে রাতারাতি ব্যবসায়ী মহলে খ্যাতিমান করে তোলে। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা তাঁর কয়লার কদর করতেন। তাঁকে তাঁরা 'কিং অফ ব্ল্যাক ডায়মন্ড' উপাধিতে ভূষিত করেন। কয়লার কারবারে তিনি প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে ওঠেন।

বামনদাস ছিলেন অত্যন্ত কালী ভক্ত। নিজ আরাধ্য দেবীর একটি দেবালয় তৈরির জন্য কলকাতার উপকণ্ঠে জমির খোঁজ করতে থাকেন। বন্ধু অমৃতলালের সাহায্যে তিনি ৩৫ বিঘার একটি বিশাল বাগানবাড়ি কেনেন কাশীপুরে ১৮৯৪ সালে। কালক্রমে উক্ত বাগানবাড়িতে গড়ে ওঠে বামনদাসের চারমহলা বাড়িসহ ঠাকুরবাড়ি।

ঠাকুরবাড়িসহ বসতবাড়ি ২ বিঘা জমি জুড়ে। ঠাকুরবাড়ির অধিষ্ঠাত্রী দেবী কৃপাময়ী কালী বিগ্রহ বামনদাস তৈরি করান কালো কষ্টিপাথর দিয়ে। ১৮৯৪ সালের ৩০ ফাল্গুন প্রতিষ্ঠা হয় দেবী বিগ্রহ। সঙ্গে দুই শিব দুর্গেশ্বর ও ক্ষেত্রেশ্বর। ঠাকুরবাড়ির গঠনশৈলী বঙ্গীয় মিশ্র দালান রীতিতে। কৃপাময়ী-র

(এরপর ১২ পাতায়)

ওড়িশার প্রত্যন্ত গ্রামে মহিলাদের স্ব-নির্ভরতা

মিতা রায়

একবিংশ শতাব্দীতে মহিলাদের অগ্রগতি এবং সামনের সারিতে সংগ্রামী ভূমিকার নিদর্শন প্রমাণ করে যে, আজও যতই নারীদের ওপর নির্যাতন আর অবদমন বজায় থাকুক না কেন;তারই মাঝখান দিয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরের মহিলারা স্ফুলিঙ্গ হয়ে প্রতিবাদী হয়ে উঠছে, তেমনি স্বাবলম্বী হয়ে দাঁড়াবার পথ যেমন তৈরি করছে। শুধুমাত্র স্বামীর উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল নয়, নিজের পরিশ্রমে অর্থ উপার্জন করে যাচ্ছে। এমনই একটি গ্রামের কথা এই প্রতিবেদনে। এ আমাদের পশ্চিমবাংলা নয়, ওড়িশা রাজ্যের এক গন্ডগ্রামের কথা।

ওড়িশায় পিছিয়েপড়া গ্রাম পিডোডামা। কন্ধমাল জেলার দারিঙ্গাবাড়ি ব্লকে ওডাহমা পর্বতের কোণে গ্রামটি অবস্থিত। এখানে সাক্ষরতার কথা তো দূর অস্ত, বিদ্যুতের আলো আজকের সভ্যতার যুগেও পৌঁছায়নি। খাবার জলেরও কোনও ব্যবস্থা নেই। এই গ্রামের চার'শো অধিবাসী কান্ধামার উপজাতিভুক্ত। তাদের ভাষার নাম

অঙ্গনা

কুই এবং ওড়িয়া। যেখানে স্বাক্ষরতার কোনও প্রশ্ন নেই, সেখানে কিন্তু খুঁজে কয়েক জনকে দেখা যায় সামান্য কিছু লিখতে বা পড়তে জানে। যে গ্রামের এহেন অনুন্নত পরিস্থিতি, সেখানে ব্যতিক্রমী এই গ্রামের মহিলারা। তারা সমাজে এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত রেখেছে স্ব-নির্ভর হয়ে। স্বামীর ওপর নির্ভরশীল নয়। কীভাবে এই অচিন্ত্যনীয় ঘটনা সম্ভব হল — তা জানতে আমরা তাদের কাজকর্ম খুঁটিয়ে দেখি।

এই গ্রামে হলুদের উৎপাদন প্রচুর। হলুদকে কেন্দ্র করে, নতুন এক ভাবনা জাগিয়ে তোলেন এই গ্রামের লক্ষ্মীদিদি। তিনি এক বেসরকারি সংস্থার কর্মী। স্বনির্ভর হওয়ার কথা তিনি গ্রামের মহিলাদের নানাভাবে বোঝান। ২০০২-এ তিনি এই ধারণায় বশীভূত করেন গ্রামের মহিলাদের। মাত্র দু'বছর গ্রামের মহিলাদের নিয়ে তিনটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে ওঠে — ইলুটিপা, পেনিনিদা, একতা। আদিবাসী ভাষায় এই নামকরণের বাংলা অর্থ — নতুন জীবন,

মানসিক পরিবর্তন আর একতা তো সহজবোধ্য। জনজাতিমহিলাদের নিয়ে গড়ে ওঠা তিনটি স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর ব্যবসা হল হলুদ। কিন্তু অর্থের প্রয়োজন। ২০০৫-০৬-এ ইলুটিপা গোষ্ঠী স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে সতেরো হাজার টাকা ঋণ নিয়ে শুরু করে ব্যবসা। অভূতপূর্ব সাফল্য দেখা গেল মাস চারেকের মধ্যেই। তারা সুদসহ ঋণ পরিশোধ করেও বারো হাজার টাকা লাভ করেন। কয়েক মাসের মধ্যে এই সাফল্যকে মূলধন করে আরও বেশি টাকা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে এবং নিজেদের লাভের টাকা ব্যবসার কাজে লাগিয়ে হলুদের ব্যবসাকে বিস্তার করতে শুরু করেন। স্বভাবতই, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সীমা বড় হতে থাকে। হলুদ উৎপাদন এ গ্রামে বরাবরই ভাল হয়। কিন্তু আগে এইসব উৎপাদিত হলুদ দালালদের হাতে চলে যেত। তারা অতিরিক্ত মূল্যে বাজারে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ লাভ করত। কিন্তু এখন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে মহিলারা উৎপাদিত হলুদ সরাসরি বাজারে বিক্রি করতে পেরে আয় করতে পারছে। এর ফলে তাদের মধ্যে নিজস্ব উপার্জনের ইচ্ছা বেশি মাত্রায় জেগে উঠছে এবং কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। গ্রামের মহিলাদের লক্ষ্মীদিদি বুঝিয়েছিলেন মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নেওয়া বন্ধ করতে হবে এবং তখনই তিনি ওদের মধ্যে সঞ্চয় করার মানসিকতা জাগিয়ে তোলেন। বোঝান যে, প্রতিদিন অল্প অল্প করে টাকা বা চাল সঞ্চয় করা উচিত। এটাই তাদের স্ব-নির্ভর হওয়ার এবং ঋণ বন্ধের প্রথম ধাপ।

এই প্রেরণায় গ্রামের আপামর জনসাধারণ সঞ্চয় করতে শিখল। মাসের শেষে দেখা গেল এক স্থানে গ্রামের যৌথ ফাণ্ড তৈরি হল। প্রতিটি পরিবার মাসে দশ টাকা প্রথমে এবং পরে পনেরো টাকা কখনও বা কুড়ি টাকা করেও মাসে মাসে জমাতে শুরু করল। যারা জমাতে পারল না, তারা অন্যভাবে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এল। সঞ্চয় নিয়মিত হবার কিছুদিন পর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হল, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নামে। গ্রামের মহিলাদের তৈরি করা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দায়িত্ব পালনে ও বন্টনে, পদাধিকারী নির্বাচন, নিয়মিত মিটিং, হলুদ বিক্রির কাজ তারা নিজেরা করতে শিখে গেলেন। এর ফলে তাদের জীবনে স্বচ্ছলতা, স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে এল। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দেই তৃপ্ত রইল না, সন্তানদের লেখাপড়া শেখানো, স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে পালস পোলিও টিকাকরণের ব্যাপারেও সচেষ্ট হল। তাদের ডাকে সরকারের স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষাকর্মীরা আসতে শুরু করল।

সেই অন্ধকারে পিছিয়ে থাকা পিডোডামা গ্রাম আজ আলোকোজ্বল। সেখানকার জনগণের জীবনযাত্রার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণভাবে বদলে গেছে। তিনটি স্ব-নির্ভরগোষ্ঠী আলোকবর্তিকার মতো অন্যান্য গ্রামের মহিলাদের স্ব-নির্ভর করে তোলার প্রেরণা দিচ্ছে। মহাজনদের রমরমা নিস্তেজ। প্রয়োজনে মানুষ স্ব-নির্ভর গোষ্ঠীর কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে। পিডোডামা গ্রামের বাহাত্তর জন মহিলার নেতৃত্বে হলুদ ব্যবসায় আসতে শুরু করেছে প্রচুর অর্থ। লক্ষ্মীদিদির মতো আরও অনেক মহিলাদের নেতৃত্বে গ্রাম উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাদের মনে জাগিয়েছে দৃঢ়তা। নিজেদের অধিকার সম্পর্কেও সচেতন হয়েছে। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে সেও যে একজন তাদের সমকক্ষ — এটা বুঝতে শিখেছে। সুরক্ষা, সামাজিক মর্যাদায় গ্রামের মহিলারা আজ অনেকটাই নিশ্চিন্ত।

ত্রিপুরার সন্ত

গুরুদেব শান্তিকালী

ডঃ জগদীশ গণ চৌধুরী

ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তের সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত মনীন্দ্র রোয়াজা পাড়াতে আনুমানিক ১৯৬০ খৃস্টাব্দে ভূমিষ্ঠ হন এক নবজাতক। যিনি উত্তরকালে গুরুদেব শান্তিকালী নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর পিতার নাম ধনঞ্জয় ত্রিপুরা। তাঁরা নোয়াতিয়া ত্রিপুরী সম্প্রদায় ভুক্ত। ধনঞ্জয় ত্রিপুরা ছিলেন কৃষিজীবী, জুমচাষী, গৃহী। বিয়ের পর কালক্রমে তিনটি সন্তান জন্মেছিল, কিন্তু তিনটি সন্তানই শৈশবে মারা যায়।

পুত্রশোকাতুরা মাতা দুঃখ করে শিবের নিকট মনের আকুতি জানাতেন। এক রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ পাহাড়স্থিত মন্দিরে গিয়ে শিবের পূজা দিলে পুত্রলাভ হবে। পরদিন ভোরে স্বামীকে বল্‌লেন স্বপ্নের কথা। অতঃপর শুভদিনে শুভক্ষণে উভয়ে যাত্রা করলেন চন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে। উঁচু পাহাড়ের চূড়াতে অবস্থিত মন্দিরে উঠতে অনেক সিঁড়ি আছে। শ্রান্ত, ক্লান্ত পথিকের আর যেন পা চলে না। প্রায় মাঝপথে উঠেছেন, এমন সময় এক দিব্যকান্তি সন্ন্যাসী উপর থেকে নেমে এলেন। ক্লান্ত পথিকের অবস্থা দেখে দয়ালু সন্ন্যাসী বললেন, আর উঠতে না পারলে, আমায় দাও, আমিই শিবের চরণে নিবেদন করব। পথিক বললেন, আমরাই নিবেদন করে মনের বাসনা জানাব। উত্তরে সন্ন্যাসী বললেন, বেশ তাই করো। কিন্তু নিজেরা উপরে উঠতে চেষ্টা করেও আর পা চলে না। তাই সন্ন্যাসীকে পুনরায় ডেকে মনের বাসনা জানালেন এবং পূজার উপকরণ দিয়ে দিলেন। সন্ন্যাসী বললেন, তোমাদের পুত্রলাভ হবে, সে হবে মহান, তার নাম রেখো শান্তি, ভূমিষ্ঠ হবার প্রথম দশ দিন খুব সাবধানে রাখবে।

যথাসময়ে এক শিশু জন্মিল। কিন্তু এক দুর্ঘটনা ঘটে গেল। বন্য বানর এসে অতর্কিতে শিশুকে নিয়ে গেল। চারিদিকে হইচই পড়ে গেল। কয়েকদিন পর এক বিশাল বটগাছের নীচে শিশুকে ফিরে পাওয়া গেল। এই ভাবে সন্ন্যাসীর সাবধান -বাণী সত্য হল।

শিশু ক্রমেই বড় হতে লাগল। এই কিশোর অন্যদের চাইতে ভিন্ন প্রকৃতির। একটু শান্ত প্রকৃতির। কয়েক বৎসর যেতেই, নিকটবর্তী পাঠশালায় ভর্তিকরানো হল। মনু বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়াকালীন এই কিশোরের মনে ভাবান্তর হল। ভাবান্তর ক্রমে ভাবাবেগে পরিণত হল। পড়াশুনা ভাল

গুরুদেব শান্তিকালী

লাগে না। বিদ্যালয়ে যেতে অনিচ্ছা। মা-বাবা আর বাধ্য করেননি, জোর করেননি বিদ্যালয়ে গতানুগতিক পড়া চালিয়ে যেতে। ক্রমে ক্রমে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর কথা। তাঁর কথা শুনতে প্রায়ই লোক আসতে থাকল। সপ্তাহে দুই দিন, শনিবারে ও মঙ্গলবারে লোক সমাগম বেশি হতে লাগল। তাঁর উপর কালী দেবী ভর করতেন বলে তাঁর অনুভব হত। ওই অবস্থাতে তিনি যা বলতেন তাতে অনেকেই উপকৃত হয়েছে। সেই থেকেনাম হয়ে গেল শান্তিকালী। তিনি কালী দেবীর মতো মহিলা পোশাক ব্যবহার করতেন।

১৯৮০ সালের জুন মাসে ত্রিপুরাতে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছিল। দাঙ্গা বেধেছিল ত্রিপুরী ও বাঙালিদের মধ্যে। ত্রিপুরাতে এত বেশি বাঙালি আগমনকে সুনজরে দেখেনি কতিপয় ত্রিপুরী। সেই অসন্তোষের বহ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে থাকল কিছু কিছু বিদেশী কুচক্র।

ফলে অসন্তোষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে ভয়াবহ রূপ নিল। শান্তিকালী সাম্প্রদায়িকতার কন্টকাকীর্ণ পথে পা বাড়াননি এবং বিদেশাগত সংস্কৃতির প্লাবনেও গা ভাসাননি। তিনি ছিলেন বাহ্যত কোমল, স্নিগ্ধ, আত্মভোলা, খোশ মেজাজী। কিন্তু অন্তরে দৃঢ়চিত্ত, আপন বিশ্বাসে অবিচল, নিষ্পাপ, নিরহঙ্কার, নির্লোভ। তাঁর ভেতরে বিশুদ্ধ মূলধন এতবেশি ভরপুর ছিল বলেই, তিনি বলতে পারতেন, 'সেই আমি, সোহহম্, আমিই কালী'।

জাগতিক অর্থে তাঁর ভেতর লেখাপড়ার ঘাটতি ছিল। তিনি সেই ঘাটতি পূরণ করেছিলেন সাধনার দ্বারা, পূতঃচরিত্রবল দ্বারা। লেখাপড়া বুদ্ধি বৃত্তি ও মননশীলতা বাড়াতে পারে, হৃদয়বল বাড়াতে সব সময় পারে না। সাধনা ও জীবসেবা পারে হৃদয়বল বাড়াতে। জিরানিয়ার আশ্রমটি ১৪.৪.১৯৯৪ তারিখে স্থাপিত এবং এটাই প্রধান কর্মকেন্দ্র। তিনি প্রয়োগবাদী ছিলেন।

শান্তিকালী কান পেতে শুনেছিলেন ত্রিপুরাবাসীর হৃদয়ের কথা। সেই হৃদয়ের কথা হল বাউল সঙ্গীত, ভক্তিগীতি, হরিনাম সংকীর্তন। এইসব গানে ত্রিপুরাবাসী মাতোয়ারা হয়। এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও আগরতলাতে, মান্দাইতে এবং আরও অন্য অনেক গ্রামে কীর্তন হয়, হরিসভা হয়। ইহা এক মহামিলনের সূত্র। তাঁর জীবন প্রণালীতে ঋষির জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের তেজ, গৃহীর কর্মপ্রেরণা নিহিত ছিল। তাই বার বার আহত হয়েও, প্রতিহত হয়ে, প্রাণনাশের হুমকি পেয়েও হত-উদ্যম হননি, পিছু টান দেননি। তাঁরা চিত্তে দুই ভূমির স্পন্দন অনুভূত হয়েছিল। প্রথম ভূমি হল রক্ষণশীল সমাজ, দ্বিতীয় ভূমি হল নব্যদলের উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা।

নিজ আশ্রমেই গুরুদেব শান্তিকালী ১৭. ৮. ২০০০ তারিখে আততায়ীর গুলিতে শহীদ হন।

বামনদাস মুখার্জীর বাড়ি

(১১ পাতার পর)

মূল মন্দির নির্মিত নবরত্ন পদ্ধতিতে। অর্থাৎ মন্দির মস্তকে নয় চূড়ার সমাহার। সামনে প্রশস্ত উঠান। চারদিকে পাথরের বারান্দা। বারান্দার দুধারে নানা আকারের ঘর, কাছারী ও কর্মচারীদের বসবাসের জন্য। দেবী কৃপাময়ী শাক্ত দেবী হলেও পূজা হয় বৈষ্ণবীয় রীতিতে। ঠাকুরবাড়ির বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক বামনদাসের প্রপৌত্র অসীম মুখার্জী জানালেন এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁদের পরিবারের এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। বিপ্লবী খগেন চ্যাটার্জীর সাথে তাঁর পিতামহ মন্মথনাথের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। সে সূত্রে বামনদাসের বাড়ি ছিল বাংলার বিপ্লবীদের আত্মগোপনের স্থান। ঠাকুরবাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণের ঘরটি ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতৃবৃন্দ শরৎচন্দ্র বসু, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি, খগেন চ্যাটার্জী প্রভৃতি নেতাদের গোপন শলাপরমর্শের নিরাপদ জায়গা।

১৯৩৮ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু হরিপুরা কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর কলকাতায় যে কয়েকটি স্থানে তাঁর সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়, বামনদাসের কালীবাড়ি তার মধ্যে অন্যতম। তিনি এখানে সম্বর্ধনার জন্য আসেন রাত্রি দেড়টায়। ঠাকুরবাড়ির সেবায়েতরা আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন সেই অমর স্বাধীনতা সংগ্রামীর স্মৃতি। তাঁরা মনে করেন দেবী কৃপাময়ী তাঁর এই দেশবরেণ্য সন্তানকে দিয়েছেন অযুত শক্তি, উৎসাহ ও লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার দৃঢ় সংকল্প।

বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে বিবেকানন্দ পাঠচক্র

স্বামী বিবেকানন্দের ১৪৭ তম জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করে বিবেকানন্দ পাঠচক্র ১২, ১৭ ও ১৮ জানুয়ারি নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। চক্ষু পরীক্ষা শিবির, ই সি জি শিবির, ছেলে- মেয়েদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, বীরপূজা অনুষ্ঠানে যোগাসন, দেহসৌষ্ঠব ও শারীরিক ক্রিয়া কৌশলের প্রদর্শনী, জাগলিং খেলা ছিল অনুষ্ঠানের অঙ্গ। আন্তর্জাতিক খ্যাতির জাগলার অভয় মিত্র ও অভিষেক মিত্র সকলের মন কেড়ে নেন।

১৭ জানুয়ারি আলোচনা সভায় কর্ণেল সব্যসাচী বাগচী প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, বিবেকানন্দ যে নতুন হিন্দুত্বের সূচনা শিকাগো ধর্মসভায় করেছিলেন, সেই হিন্দুত্বের ধারণাই ভারত ও বিশ্বের বাঁচার পথ। হিন্দুরা অসত্য থেকে সত্যে যায় না। সত্য থেকে আরও বৃহৎ সত্যে উত্তীর্ণ হতে চায়। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত ও পাঠচক্রের সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

বক্তব্য রাখছেন স্বামী অনিরুদ্ধানন্দ মহারাজ, বসে তুষারকান্তি মজুমদার।

১৮ জানুয়ারি সিমলা ব্যায়াম সমিতির মাঠে আনন্দ সন্ধ্যায় কেকা চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় রূপ ভারতী নৃত্যগোষ্ঠী গানে ও নাচে স্বামীজীর জীবনালেখ্য পরিবেশন করে। সংস্কার ভারতীর নৃত্যাঞ্জলি-'সমর্পণ' সবাইকে মুগ্ধ করে। ভাষ্যপাঠে সুদীপ দত্ত সকলের প্রশংসা লাভ করেন। বিকাশ ভট্টাচার্যের নাট্যরূপ তথা ছত্রপতি শিবাজীর জীবনী অবলম্বনে নাটক "রাজযোগী' মঞ্চ স্থ হয়।

১৮ জানুয়ারি স্বামীজী প্রণাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী তথা স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক জন্মভিটা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সহ-সম্পাদক স্বামী অনিরুদ্ধানন্দ মহারাজ (সঞ্জীব মহারাজ)। পাঠচক্রের সহ-সভাপতি তুষারকান্তি মজুমদার সমাপ্তি উৎসবে পৌরোহিত্য করেন।

সারথী-র জগদীশচন্দ্র বসু স্মরণে রক্তদান দেখছেন বিশ্বনাথ মুখার্জী।

রক্তদান শিবির

বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর সার্ধশত জন্মজয়ন্তী বর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে 'সারথী সমাজ সেবা সংগঠন' নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সমাজ সেবা ভারতী দ্বারা অনুমোদিত সারথী সমাজ সেবা সংগঠন সেবা কাজের জন্য প্রসিদ্ধ। গত ১১ জানুয়ারি সেবা সংগঠন কলকাতার রামমোহন বেরা লেনের গোবরা ইয়ং এ্যাথলেটিক ক্লাবে এই শিবিরের আয়োজন হয়।

এদিন রক্তদানের পাশাপাশি মহান বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। শুধু তাই নয়, অনুষ্ঠানে সারথীর বিগত দু'বছরের কর্মসূচী ও আগামী বছরের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনা চক্রে বৃক্ষ রোপণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বক্তারা এবিষয়ে তাদের অভিমত প্রকাশ করেন।

কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন সঙ্ঘের কলকাতা সম্ভাগের সঙ্ঘচালক তথা সমাজ সেবা ভারতীর (পশ্চিমবঙ্গ) সভাপতি বিশ্বনাথ মুখার্জি। গোবরা ইয়ং এ্যাথলেটিক ক্লাবের সভাপতি চাঁদ রায়সহ শরদেন্দু মুখার্জি, রামেন্দু বিশ্বাস প্রমুখ।

নবদ্বীপে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির

২ জানুয়ারি নবদ্বীপে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবিরের শুভ উদ্বোধন হল।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হরিহর চট্টোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট অতিথি ছিলেন যথাক্রমে ক্রীড়াবিদ্ শান্তিময় ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক জয়দেব ভট্টাচার্য। মুখ্যবক্তা ছিলেন ডঃ কুমারনাথ ভট্টাচার্য

প্রার্থনা প্রতিযোগিতা

দক্ষিণবঙ্গের সাধারণ স্বয়ংসেবকদের প্রার্থনা প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্যায় গত ১১ জানুয়ারি কেশব ভবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। বিভিন্ন জেলা থেকে নির্বাচিত ৩৫ জন তরুণ ও ৩১ জন বালক এতে অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিযোগিতার উদ্বোধনে ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর অন্যতম পার্ষদ বন্ধু গৌরব ব্রহ্মচারী উপস্থিত ছিলেন। সংস্কৃতের প্রশংসা ও মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার নিন্দা করে বলেন, তিনি "বিশ্বম্ একনীড়ং ভবিষ্যতি" অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব একটি গৃহ হবে একথা আমাদের শাস্ত্রেই আছে। সমাপ্তি ভাষণে পূর্বক্ষেত্রের সহ-ক্ষেত্রীয় প্রচারক অজিত মহাপাত্র বলেন, আমাদের স্বয়ংসেবকদের লক্ষ্য স্থির রাখার জন্য প্রার্থনা নামক সংস্কার নিত্য করণীয়। উপস্থিত স্বয়ংসেবকরা স্বামীজীর জন্মদিন গত ১২ জানুয়ারি শোভাযাত্রা সহকারে স্বামীজীর বাড়িতে গিয়ে, মাল্যদানপূর্বক ভক্তি নিবেদন করেন।

বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের এবং বিজ্ঞান ভারতীর সাধারণ সম্পাদক ডঃ পতাকীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আচার্য জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে সক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সংগ্রহশালার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ডঃ কল্যাণ মুখোপ্যাধ্যায়ও কেশব ভবনে আচার্যের আবিষ্কার সম্বন্ধে দু'চার কথা বলেন।

রাষ্ট্রীয় পরিষদে ভাষণ দিচ্ছেন মাধব মেনন।

অধিবক্তা পরিষদের রাষ্ট্রীয় পরিষদ বৈঠক

গত ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর ২০০৮ তামিলনাড়ু রাজ্যের রামেশ্বরমে অনুষ্ঠিত হল অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদের রাষ্ট্রীয় পরিষদ-এর বার্ষিক বৈঠক। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন ল' ইনস্টিটিউট খ্যাত বিশিষ্ট আইনজ্ঞ মাধব মেনন। বিচারক পর্বত রাও-এর সভাপতিত্বে এই দু'দিনের বৈঠকে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ১০৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বাংলা প্রান্ত থেকে কালিদাস বসু, কমল ঘোষ দস্তিদার, জয়দীপ রায় প্রমুখ আইনজীবী ও পদাধিকারীরা অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকের সমারোপ ভাষণ দেন মদন দাসজী। বৈঠকের শেষে সমস্ত প্রতিনিধিরা ঐতিহ্যমন্ডিত "রামসেতু দর্শন" করেন।

বেলডাঙ্গায় স্বামীজীর জন্মোৎসব

গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ মূর্তি প্রতিষ্ঠা স্মারক সমিতির উদ্যোগে স্বামীজীর ১৪৭ তম জন্মদিনে মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গায় ছাপাখানার মোড়ে আয়োজিত শ্রদ্ধাঞ্জলি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যাপক ডঃ সুশীল কুমার রুদ্র বিশিষ্ট অতিথির ভাষণে বলেন, আজকের দিনে ও সময়ের প্রেক্ষিতেও স্বামীজীর অভিমত একশো ভাগ সত্য। এদিন সকালে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের গান গাইতে গাইতে বেলডাঙ্গা নগর পরিক্রমা করে ছাপাখানার মোড়ে মূর্তির পাদদেশে সমবেত হন।

ওইদিন আরও একটি শোভাযাত্রা সারদা রামকৃষ্ণ পাঠচক্র স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা স্বামীজীর ট্যাবলো নিয়ে নগর পরিক্রমা করে এবং ছাপাখানায় স্বামীজীর মূর্তির পাদদেশে মিলিত হয়। প্রণব ভারতীর ব্যান্ড ড্রিলের ৭৫ জনের দল স্বামীজীকে অভিবাদন জানান। তারাও স্বামীজীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানান বিজেপি-র দুই কাউন্সিলর সুমিত ঘোষ, অলোক ঘোষ। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পক্ষে মানস মন্ডল, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পক্ষে রাজকুমার ঘোষ সহ বিভিন্ন সংস্থা স্বামীজীর মূর্তিতে মালা দেন। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বংশীবদন প্রামাণিক সম্প্রদায়। অনুষ্ঠান সফল হওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ দেন কমিটির সম্পাদক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এছাড়া বেলডাঙ্গা সারদা রামকৃষ্ণ পাঠচক্র, বাবুপাড়ার উদ্যোগে ১৭ জানুয়ারি দুপুরে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথির দিন বেলডাঙ্গা নগরে এক শোভাযাত্রা প্রদক্ষিণ করে। এ উপলক্ষে ১৮ জানুয়ারি পাঠচক্র কার্যালয়ে বার্ষিক উৎসবে এক আলোচনা সভায় বক্তারা স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ ও সারদা মায়ের উপর আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী সুপ্রভানন্দজী মহারাজ। কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠের ভক্তিপ্রিয়নন্দজী মহারাজ।

ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিকাল সোসাইটি-র আন্তর্জাতিক সেমিনার

আশিস গঙ্গোপাধ্যায় ।। এশিয়ার প্রাচীনতম বৈজ্ঞানিক সংস্থা "ক্যালকাটা ম্যাথেমেটিকাল সোসাইটির" শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে ২০০৮-এর ১৯ থেকে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন হয়। মূল আলোচ্য বিষয় ছিল বর্তমানে গণিতের উন্নতি এবং তার প্রয়োগ। উদ্বোধনী ভাষণে আমেরিকার টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক ডঃ ওয়েন সেমিনারের বিষয় নির্বাচনের প্রশংসা করেন। আয়োজক সংস্থার সম্পাদক অধ্যাপক মহিম অধিকারী সংক্ষেপে সংস্থার ইতিহাস এবং কার্যক্রম সম্পর্কে বলেন, এদেশে গণিতের উন্নতি সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেন সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক বিনয় কুমার লাহিড়ী। যে সমস্ত বিদেশী গণিতজ্ঞরা তাঁদের নিজেদের দেশের গণিতের উন্নতি এবং তার প্রয়োগ সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা করে অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন অধ্যাপক ওয়েন ছাড়া আমেরিকার ডঃ কার্ল সোপ্স, স্পেনের ডঃ আলফানসো ক্যারিয়াজো, সুইডেনের ডঃ এরিক ট্রেল, গ্রীসের ডঃ মামালৌকাস এবং জাপানের ডঃ মায়েদা, ডঃ আদাচি, ডঃ আকিরা আসাদা প্রমুখ। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের যেসমস্ত বক্তা গণিতের উন্নতির প্রেক্ষাপটে নিজেদের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মহারাষ্ট্রের পি এম সালভে, অন্ধ্রের কে আর তেজা, তামিলনাড়ুর মে পরিমল এবং গোয়ার পি কুমার প্রমুখ।

এ রাজ্যের থেকে আলোচনায় অংশ নেন ডঃ মহিম অধিকারী, ডঃ হিমাদ্রিপাই মজুমদার, ডঃ স্বপন কুমার সাহা এবং ডঃ শর্বরী গুহ প্রমুখ।

শিলিগুড়ির সারদা শিশু তীর্থের ছাত্রী সম্মানিত

বিদ্যাভারতী দ্বারা পরিচালিত শিলিগুড়ির 'সারদা শিশু তীর্থ' বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী অন্বেষা পাল জেলার মুখ উজ্জ্বল করল। সম্প্রতি দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের যোজনায় আয়োজিত 'রাষ্ট্রীয় চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা'-য় অন্বেষা তৃতীয় স্থান দখল করেছে। কেন্দ্রীয় স্তরের এই সম্মানে স্কুলের আচার্য থেকে পড়ুয়ারাও রীতিমতো গর্বিত।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে প্রদেশের কার্যকর্তাবৃন্দ।

উত্তরবঙ্গের শীতকালীন সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ

গত ৫ জানুয়ারি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের শীতকালীন সঙ্ঘশিক্ষা বর্গ শুরু হয়েছে। চলবে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শালবাড়ির বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ হোমবাহাদুর ছেত্রী। বক্তব্য রাখেন সঙ্ঘের প্রান্ত প্রচারক মাননীয় অদ্বৈত চরণ দত্ত। বর্গে উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলা, যথা — সিকিম উঃপূর্ব, সিকিম দঃপশ্চিম, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং থেকে ২২ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছেন। বর্গ কার্যবাহ হিসাবে আছেন কালিম্পং জেলা সহ-কার্যবাহ রাজ বাহাদুর রাই।

রঙ্গম

চলে গেলেন অনুভূতিপ্রবণ পরিচালক তপন সিংহ

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।। গত ১৫ জানুয়ারি মারা গেলেন বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম সত্যনিষ্ঠ ও অনুভূতিপ্রবণ পরিচালক তপন সিংহ। মৃত্যু তাঁর পরিণত বয়সেই— ৮৪। তবে তাঁর মৃত্যু সংবাদকে ঘিরে একটি প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রে যে আক্ষেপ প্রকাশিত হয়েছে তা অবশ্যই পর্যালোচনার দাবি রাখে। সংবাদটি (প্রতিদিন ১৬।১।০৯) বেদনাদায়ক হলেও পুরোপুরি প্রত্যাশিত। সংবাদে প্রকাশ দাদা সাহেব ফালকে থেকে অসংখ্য দেশী ও বিদেশী পুরস্কারে সম্মানিত এই বিশিষ্ট বাঙালি পরিচালককে শেষ সম্মানটুকু জানাতে পশ্চি মবঙ্গ সরকারের সংস্কৃতিবান মুখ্যমন্ত্রী তো নয়ই তাঁর মন্ত্রীসভার অন্য ছোটখাট কোনও মন্ত্রীও সশরীরে একটি পুষ্পস্তবক নিয়ে সেখানে যাননি। অবশ্যই দপ্তরের পক্ষ থেকে না করলে নয় মাফিক ফুল পাঠানো হয়েছিল। অথচ কিউবা বা ভেনিজুয়েলার কোনও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পী-সাহিত্যিক মরলে এরা শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েন। আগে বলেছি এমন অসদাচরণ প্রত্যাশিত কিন্তু একটি গণতান্ত্রিক শিষ্টাচারধীন দল নিজস্বার্থে আঘাত লাগলে স্বনামধন্য, দেশ বরেণ্য মৃত মানুষের প্রতিও কতটা প্রতিহিংসাপরায়ণ হতে পারে তার একটি নজির আবার নির্লজ্জভাবে উপস্থাপন করল। সংবাদে প্রকাশ, রাজ্যের এক বিরোধী নেত্রীর অনশনের সময় প্রয়াত পরিচালক তাঁর সমর্থনে একটি চিঠি লিখেছিলেন (চিঠির প্রতিলিপিও প্রকাশিত হয়েছে প্রতিদিন ১৬।১।০৯)। এটিই সম্ভাব্য কারণ।

না। এই প্রসঙ্গে শ্রীসিংহের চলচ্চিত্র ভাবনা ও প্রয়োগ এবং তার সামগ্রিক অভিমত নিয়ে একটু আলোচনা করলে এই কদর্যতার দিকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

তপন সিংহ (১৯২৪-২০০৯) তাঁর কাজ ১৯৫৪ সালে 'অঙ্কুশ' ছবি দিয়ে শুরু করেন। তখনকার সময়ে হাতিকে উপজীব্য করে ছবি করার কথা কেউ ভাবতেও পারেননি। প্রথম ছবিই তাঁর স্বকীয়তার পর্যাপ্ত স্বাক্ষর বহন করে। এরপর কাবুলিওলা (১৯৫৭) থেকেই তাঁর জয়যাত্রা শুরু হয়। সুস্থ, সামাজিক বাঙালি জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অতি সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য নির্ভর বিষয়গুলি নিয়েই ছবি করাই পচ্ছন্দ করতেন পরিচালক। আজকে যে কেউই তাঁর বিগত দশকগুলিতে নির্মিত ক্ষণিকের অতিথি,

হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, অতিথি, জতুগৃহ, গল্প হলেও সত্যি, আপনজন প্রভৃতি অসংখ্য মানবিক আবেদনে স্নিগ্ধ শিল্পসুষমামন্ডিত ছবিগুলি দেখলে হারানো বাঙালি সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের চাওয়া-পাওয়া ও আজকের রিক্ততার দিকটি উপলব্ধি করতে পারবেন।

তপনবাবু আজীবন ব্যক্তি মানুষের চারিত্রিক দৃঢ়তা, নিষ্ঠা ও আপোষহীন মনোভাবের ও মানবিক মূল্যবোধের ওপর আস্থা রেখেছিলেন, যা তিনি বারবার তাঁর আরোহী, কাবুলিওলা, নির্জন সৈকতে, সাগিনা মাহাতো, বাঞ্ছারামের বাগান, আতঙ্ক, এক ডক্টর কি মত (হিন্দী) প্রভৃতি ছবিগুলির মাধ্যমে সাধারণ চলচ্চিত্রক মুন্সীয়ানায় ফুটিয়ে তোলেন। তথাকথিত বুদ্ধি জীবী মহল পরিতাপের সঙ্গে নজর করেছেন গুণীজন সহ বুদ্ধি জীবী মহল আপামর জনসাধারণের কাছে তাঁর চলচ্চিত্রের বিপুল গ্রহণযোগ্যতা। প্রয়াত সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গেও তাঁর এই সংক্রান্ত বহু আলোচনা হয়েছিল। অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন তাঁরা। একবার দিল্লীতে সত্যজিৎ বাবু উপস্থিত না হতে পারায় তাঁর পুরস্কার (সত্যজিতের অনুরোধে) তপনবাবুই গ্রহণ করেন। তপনবাবুর অধিকাংশ ছবির নান্দনিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি সেগুলির বিপুল দর্শক সমাদরের কথা তাবৎ চলচ্চিত্র মহলই অবাক বিস্ময়ে উপলব্ধি করেছে। এর মূলে ছিল পরিচালকের প্রযোজকের প্রতি দায়বদ্ধ তা — একই সঙ্গে সমাজমনস্কতা। এখানেই তথাকথিত বামপন্থী চলচ্চিত্র প্রেমীদের চিন্তা ক্ষুদ্রতার সঙ্গে তপনবাবুর সংঘাত যা কখনই তাঁকে আদৌ বিব্রত করতে পারেনি।

এইবারে দেখবো তার প্রতি এই অবস্থা ও উপেক্ষার প্রত্যক্ষ কারণগুলি। ১৯৭০-এ নির্মিত তাঁর 'সাগিনা মাহাতো' তখনকার সময়ে এক সাড়া জাগানো ছবি। দিলীপ কুমার ও বোম্বাই-এর স্বনামধন্য নায়িকা সায়রাবানুর অভিনয় সমৃদ্ধ চলচ্চিত্রটিকে তপনবাবু ভেতরে ভেতরে ক্ষয়িষ্ণু, অসাধু বজ্জ্বস্তুন্দ্ব হুন্দক্ষ নেতাদের অন্তঃসারশূন্যতার এক অসাধারণ চলচ্চিত্রায়ন ঘটিয়েছিলেন। কপট শ্রমিক-দরদী দলস্বার্থধারী নেতার চরিত্রে অনিল চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় স্মরণীয়। এখানে বলা দরকার, তুলনায় একশো ভাগ খাঁটি, যথার্থ স্বার্থের লড়াইয়ে নামা আপোষহীন সাগিনার ভূমিকায় দিলীপকুমার দর্শকের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেন। মানুষের কাছে শ্রমিক নেতারা রাজনৈতিক শঠতা ও দুর্নীতি সেই প্রথম অসাধারণ সাবলীলতায় উন্মোচিত করেন তপনবাবু। ছবিটি বিপুল বাণিজ্যিক সাফল্য লাভের পাশাপাশি বহু পুরস্কারে ভূষিত হয়। এটি শাসক দল মনে রেখেছে।

আবার দেখা যেতে পারে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনীত 'আতঙ্ক' ছবিটি যার কেন্দ্রীয় চরিত্র মাস্টার মশাই-এর 'আপনি কিন্তু কিছু দেখেননি' হাড় হিম করা সংলাপটিতে আচ্ছন্ন যা আজও অনিচ্ছায় কোনও ঘৃণ্য কাজের সাক্ষী হওয়া মানুষকে সন্ত্রস্ত করতে প্রায় ঐতিহাসিক ভাবে ব্যবহার করা হয়। ওই একই ছবিতে তপনবাবু নির্ভীক দক্ষতায় রাজনৈতিক খুনের আসামীকে নেতাদের আড়াল করা এবং ফেঁসে গেলে ধূলোর মতো ঝেড়ে ফেলার এক মর্মন্তুদ প্রতিফলন ঘটান। তপনবাবুর অন্তর্দৃষ্টি বহু বছর আগেই আজকের শাসক দলের চরিত্রকে নগ্ন করেছিল। কিন্তু তা কখনই তিনি সোচ্চার ভাবে, ঢাক-ঢোল পিটিয়ে বোঝাননি, চলচ্চিত্রের শিল্প শর্ত মেনেই মানুষের আবেগের দরজায় নাড়া দিয়েছিলেন ।

এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসে ১৯৯২ সালে সত্যজিৎ রায় প্রয়াত হবার পর সর্বাধিক প্রচারিত বাঙলা দৈনিকে জ্যোতি বসুর জবানে লেখা হয়েছিল — উনি ট্রস্পপ্পপ্রক্কন্দ্দদ্ধ ছিলেন কিনা জানি না তবে প্রগতিশীল ছিলেন (সত্যজিৎ বাবুকে তিনি ধন্য করেছিলেন কিনা জানা নেই) আজ তাঁরই রাজনৈতিক বংশধররা যে বিশ্ববরেন্য এক চলচ্চিত্রকারকে কোনও শিষ্ঠাচারই শেখাবে না এটা আশ চর্যের কিছু নয়। পশ্চি মবঙ্গের স্বল্পবুদ্ধি, দলস্বার্থ সচেতন মস্তিষ্কের দ্বারা বিরল দক্ষতার অধিকারী আপামর জনসাধারণ, কলাকুশলী ও চলচ্চিত্র জগৎ দ্বারা সমাদৃত তপন সিংহের মূল্যায়ন না হওয়াটাই ভাল। কেননা তপন সিংহ তাঁর ছবিগুলির মধ্যে দিয়ে অজস্র বার প্রমাণ করে দিয়ে গেছেন এদের মূল্যায়ণ, শ্রদ্ধা, সমাদরের প্রত্যাশী তিনি নন। তাঁর প্রথম ও শেষ দায়বদ্ধ তা মানুষের কাছে, মানবিক মূল্যবোধের কাছে যে কাজে তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে বেঁচে থাকবেন ভারতবাসীর মনে। তপনবাবুকে প্রণাম।

শব্দরূপ - ৪৯৫

বিমল পোদ্দার

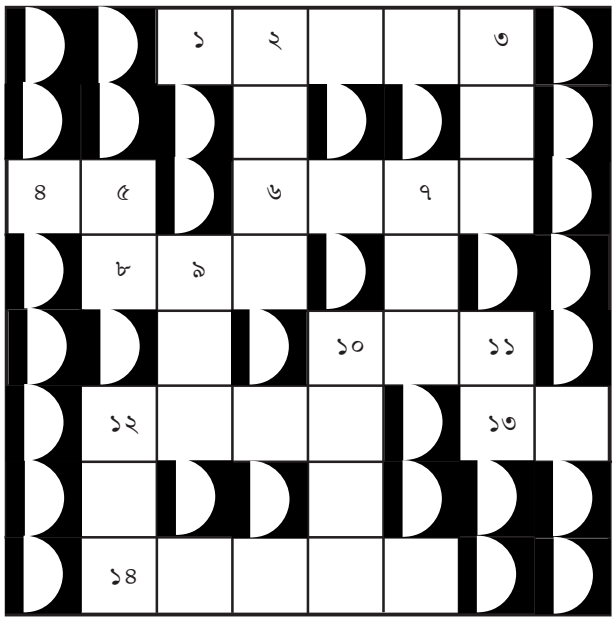

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. রামকৃষ্ণের সহধর্মিণী, ৪. পূজোর এক বৃহৎ বাদ্যি , ৬. প্রথম দুয়ে হাত, শেষ দুয়ে পর্যন্ত আসলে এই সেনাধ্যক্ষ দেবাসুর যুদ্ধে দেব সেনাপতি কর্তিককে সাহায্য করেছিল, ৮. তৎসম শব্দে সুন্দর, চারু, ১০. গঙ্গাদেবীর বাহন, ১২. কাঁসার বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, মন্দিরা প্রথম দুয়ে খাজনা, ১৩. পুষ্পহার, ১৪. সত্যযুগে কাল এর নামক দানবগণের আটপুত্র দ্বাপরে বিভিন্ন ক্ষত্রিয় নরপতি রূপে জন্মগ্রহণ করে, তাদের মধ্যে সপ্তম পুত্র যিনি, দুয়ে-তিনে টাকা, শেষ দুয়ে বছর।

উপর-নীচ ঃ ২. প্রতিশব্দে আলোকনির্দেশ, কিরণসম্পাত, ৩. মহাদেবের জনৈক অনুচর, তিনি শিব ও পার্বতীর আশীর্বাদে পৃথিবীতে কুসুমেশ্বর খ্যাত, শেষ দুয়ে আড্ডার স্থল ৫. একই শব্দে অঙ্কুর, যন্ত্র, কাকলি, ৭. অজুর্নের পৌত্র পরীক্ষিৎকে এই সাপ দংশন করে, অষ্টনাগের অন্যতম, আগাগোড়া অবধি, ৯. দুধবিহীন চা, ১০. যে মাসে হিন্দুদের পূজা-পার্বণ বা কোনও শুভ কাজ হয় না, তিনে জননী, ১১. অন্য নামে লক্ষ্মীদেবী, ১২. মথুরাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের মাতুল।

সমাধান শব্দরূপ ৪৯৩

	ল	হ	মা			সী	ম
	স্ফ		র		ৎ		গে
ফোঁ			ফ	র	মা		র
প	রি	ণী	ত				মু
র				ই	ট	বা	লু
দা		ই	শা	রা			ক
লা		স্পা		ব		ফে	
লি	খি	ত		তী	ব	র	

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯
ভরত কুন্ডু
কলকাতা-৬
সুনীল বিষ্ণু
সিউড়ী, বীরভূম।
দেবলীনা গাঙ্গুলী
হাওড়া-৪

● এই সংখ্যার সমাধান আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সংখ্যায়।

গান্ধী-নেহরু-রা নোবেল শান্তি পুরস্কার পাবেন কেন ?

শিবাজী গুপ্ত

গান্ধী ও নেহরুকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হল না কেন তা নিয়ে কিছুদিন পরপর সংবাদপত্রে ফলাও করে খবর ছাপা হয়। আর তা পড়ে এক শ্রেণীর পাঠক কি অন্যায়! কি অন্যায়!! বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কিন্তু কি কৃতিত্বের জন্য তারা শান্তি পুরস্কার পাবেন তা তলিয়ে দেখার প্রয়োজন মনে করেন না।

গান্ধী শান্তির জন্য কী করেছেন? আন্তর্জাতিক শান্তির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান শূন্য। স্বদেশে দুই যুযুধান সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি স্থাপনে তিনি চূড়ান্ত ব্যর্থ। তাঁর সমস্ত শান্তির ললিতবাণী হিন্দুদের প্রতি, মুসলমানদের মনে তিলমাত্র দাগ কাটেনি। প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, দেশভাগের প্রাক্কালে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে নারকীয় হানাহানির সময় মাউন্টব্যাটেনের চাপে মিঃ জিন্না সাম্প্রদায়িক শান্তি বজায় রাখার জন্য গান্ধীর সঙ্গে যৌথ আবেদনে রাজী হন। তার সঙ্গে যে ফটোখানা প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায় বেঁটে গান্ধী ভাই বলে জিন্নাকে আবেগ ভরে জড়িয়ে ধরলেও সমান সহৃদয়তা দেখিয়ে লম্বাটে জিন্না গান্ধীর কাঁধে নিজের হাতখানা রাখেননি। এই কৃত্রিম শান্তি প্রচেষ্টা মাঠে মারা গেছে। পশ্চিমে সিন্ধু ও পঞ্চ নদ এবং পূর্বে পদ্মা-মেঘনা-যমুনার জল মানব রক্তে রক্তাক্ত করে দেশ ভাগ হয়েছে।

গান্ধী চিরকালই বৃটিশ ভক্ত ও অনুরক্ত। তাঁর বৃটিশ বিরোধী কোনও আন্দোলনকেই তিনি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছতে দেননি। বৃটিশ সরকার অস্বস্তি ও অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়বার মুখেই তিনি আন্দোলন থামিয়ে দেন। কিন্তু তাঁর মতিভ্রম হল ১৯৪২ সালে।

সুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে তাড়াতে এবং কংগ্রেস দল থেকে বহিষ্কার করতে গান্ধী যে কূটকৌশল ও হীনপন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তাতে তার উপর জনসাধারণের ভক্তি অনেকখানি হ্রাস পায়, তিনি বিরূপ সমালোচনার মুখে পড়েন, যা পূর্বে আর কখনো ঘটেনি। এদিকে গৃহ মধ্যে সতর্ক পুলিশ পাহারায় অন্তরীণাবস্থা থেকে বৃটিশ সরকারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিয়ে সুভাষচন্দ্র সারা দেশে সাড়া ফেলে দিয়েছেন এবং আপামর জনতার স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন ও নেতৃত্ব লাভ করেন।

গান্ধী প্রমাদ গুণলেন। সুভাষচন্দ্র যে এভাবে গান্ধী ও তাঁর চেলাচামুণ্ডাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেবেন, তা তারা স্বপ্নেও ভাবেননি। নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে তারা দিশেহারা হলেন। তারপর সুভাষচন্দ্র যখন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এসে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন ও নেতৃপদ গ্রহণ করে 'নেতাজী' নামে অভিষিক্ত হলেন, তখন গান্ধী ও তাঁর নিষ্কর্মা পারিষদ দলের মধ্যে গেল গেল রব উঠল।

ভারত ছিল একটা বৃটিশ শাসনাধীন পরাধীন দেশ। সে অর্থে গান্ধী ও নেহরু ছিলেন বৃটিশ প্রজা — অন্তত স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত। সেকালে পরাক্রান্ত বৃটিশ শাসকদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে নোবেল কমিটি বাধ্য ছিল। আর সে কারণেই গান্ধী তাঁর হটকারী 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনের' জন্য এবং নেহরু তাঁর পক্ষপাতদুষ্ট শান্তি আন্দোলনের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার থেকে বঞ্চি ত হলেন না,

সে সময় বৃটিশ জাতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলার বাহিনীর আক্রমণে মহা বিপর্যয়ের সম্মুখীন। সারা লণ্ডন শহর নাৎসী বোমার আঘাতে বিধবস্ত। বৃটিশ জাতির এই চরম বিপদকালে দেশে নেতৃত্ব হারাবার ভয়ে ভীত গান্ধী 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনের' ডাক দিলেন। চির অনুগত ভক্ত গান্ধীর এই অমিত্র সুলভ আচরণ বৃটিশ জাতি ক্ষমার চোখে দেখতে পারেনি। এই একটি মাত্র অবিবেচক সিদ্ধান্তে বৃটিশের কাছে "ঞ্জসপ্সস্তু ক্ষ্ণস্তুড়ন" রাতারাতি "ক্রস্তু ক্ষ্ণস্তুড়ন" তে পরিণত হলেন — তাঁর নোবেল শান্তি পুরস্কারের পথে কাঁটা পড়ল।

এ সম্পর্কে আরও দু'চার কথা পরে। জহরলাল নেহরুর শান্তি আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ সোভিয়েট রাশিয়া ঘেঁষা ও আমেরিকা বিরোধী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর যখন দুই বৃহৎ শক্তি ঠাণ্ডা লড়াইতে মত্ত, তখন আমেরিকা আণবিক বোমার অধিকারী ও শক্তিমান। রাশিয়ার হাতে তখন আণবিক বোমা নেই, সুতরাং অস্ত্রসম্ভারে দুর্বল। অতএব শান্তি চাই। নেহরু নিরপেক্ষ জোট গঠন করে রাশিয়ার পক্ষ নিয়ে শান্তি শান্তি বলে চেঁচাতে লাগলেন। দেশে-বিদেশে পায়রা উড়িয়ে হাততালি কুড়ালেন। আর ভিয়েতনাম ও কোরিয়া যুদ্ধের জন্য আমেরিকাকে গালমন্দ করতে থাকলেন।

কিন্তু রাশিয়া যখন হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লোভিয়ার উপর অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও বর্বর আক্রমণ চালাল, তখন নেহরুর মুখে আর কথা নেই। ইতিমধ্যে এই শান্তির ডামাডোলের মধ্যে রাশিয়া আণবিক বোমা তৈরি করে ফেলেছে। এমনকী হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করে আমেরিকার এক কাঠি উপরে উঠে গেছে। নেহরুর বিশ্ব শান্তি আন্দোলনেরও পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছে।

সুতরাং যে ব্যক্তির শান্তি আন্দোলনে এই দ্বিচারিতা, তাকে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দানে নোবেল কমিটি উৎসাহ বোধ করবে কেন? জ্ঞান-বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নোবেল পুরস্কার নিয়ে তেমন আপত্তি ও সমালোচনা চোখে পড়ে না। কিন্তু শান্তি পুরস্কার বহুক্ষেত্রেই বিতর্ক জড়িত। এবং রাজনৈতিক বিবেচনা প্রভাবিত; সেজন্য সমালোচিত।

একথা ভুললে চলবে না যে, সুইডেন একটি পশ্চিমী ঘেঁষা দেশ। ক্ষুদ্র এবং দুর্বল তো বটেই। তাকে অনেক ক্ষেত্রে বৃটিশ আমেরিকার মতো পশ্চিমী দেশগুলির মতামতের গুরুত্ব দিতেই হয়। নোবেল কমিটির অধিষ্ঠানও সুইডেনের বুকেই। পশ্চিমী বৃহৎ শক্তির বিরক্তি সৃষ্টিকারী কোনও সিদ্ধান্ত নিতে নোবেল কমিটির সাহস নাও হতে পারে। এসবের তো কোনও লিখিত প্রমাণপত্র নেই; কিন্তু অনুমান করে নেওয়া একেবারে ভিত্তিহীন নয়।

আর ভারত ছিল একটা বৃটিশ শাসনাধীন পরাধীন দেশ। সে অর্থে গান্ধী ও নেহরু ছিলেন বৃটিশ প্রজা — অন্তত স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত। সেকালে পরাক্রান্ত বৃটিশ শাসকদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে নোবেল কমিটি বাধ্য ছিল। আর সে কারণেই গান্ধী তাঁর হটকারী 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনের' জন্য এবং নেহরু তাঁর পক্ষপাত দুষ্ট শান্তি আন্দোলনের জন্য নোবেল শান্তি পুরস্কার থেকে বঞ্চি ত হলেন না, বরং নিজেদের বঞ্চি ত করলেন। নোবেল কমিটিকে দোষ দেওয়া বৃথা।

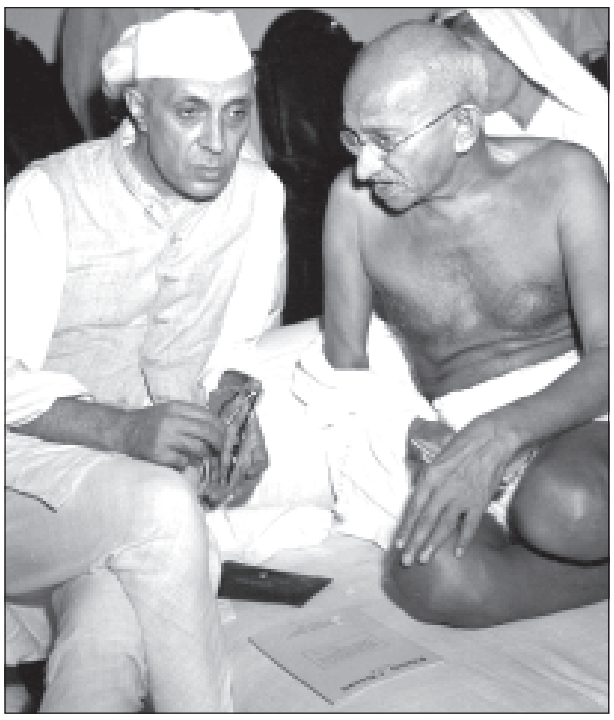

বিষাক্ত কালনাগ আই এস আই

(৮ পাতার পর)

দায়ী করেন— সন্দেহজনক উগ্রবাদীদের দেশ থেকে পালাতে সাহায্য করার ব্যাপারে। আমানুল্লাহ্ এটাকে আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বলে মনে করেন — "যদি পাকিস্তান, যারা অতীতে মুজাহিদিনদের সাহায্য করেছে, আমাদের সীমান্তে হস্তক্ষেপ করে, তারা আমাদের শত্রু হবে।" তার কথায় স্পষ্টতই পাকিস্তানের কর্মকাণ্ডে সন্দেহ প্রকাশিত হয় — "আমরা লক্ষ্য করেছি আই এস আই-র পাকিস্তানি দালালরা সীমান্তে সক্রিয়। তারা মুখে বলে যে, ওসামা বিন লাদেনের খোঁজ করছে। কিন্তু আমরা জানি না সত্যিই কী তাদের উদ্দেশ্য, অথবা, তারা কী সত্যি কথা বলছে!"

তিনি আরও বলেন — "ওসামা বিন লাদেনকে খোঁজার এই সময়ে, আমাদের এই বিদেশীদের দরকার (ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোর্সের সৈন্যদের) এবং অর্থের ও মাদকদ্রব্যের চোরাকারবার বন্ধের জন্যে।"

কোয়ানুনি তার সাক্ষাৎকারে বলেছেন — আই এস আই পাকিস্তানে লাদেনের গতিবিধির উপরে নজর রাখছে, নিঃসন্দেহে তারা জানে কী ঘটছে। সত্যি কথা হল — কোনও প্রতিক্রিয়া নেই এবং লাদেনকে গ্রেপ্তার করা যায়নি, এটাই নির্দেশ করে পাকিস্তানি আই এস আই কোনও না কোনও ভাবে তাকে সাহায্য করছে।"

অভ্যন্তরীণ মন্ত্রী বলেন — "পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্বে আই এস আই-এর ছাপ স্পষ্ট। আমাদের সাম্প্রতিক সংবাদ অনুযায়ী তারা এখনও তাই করছে আগে যা করছিল। তার অর্থ-তার, (লাদেন ও তার অনুগামীরা), একটি জায়গায়স্থিত নয়।"

"যখন সে আফগানিস্তানের বাইরে, সে প্রধানত পাকিস্তানে যায়। তাকে আফগানিস্তানের একটি পূর্বাঞ্চলেও দেখা গেছে। তার অর্থ তারা চলনশীল। তারা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় নেই। তারা প্রধানত পাকিস্তানে এবং সম্ভবত অন্য সময়, আফগানিস্তানে।"

আফগানিস্তানের অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যরা, বিশেষ করে যারা নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের সঙ্গে পূর্ববর্তী তালিবান শাসকদের সঙ্গে লড়াই করেছেন, পাকিস্তানের জন্যে, যারা তালিবানদের সমর্থন দিয়ে এসেছে, বিন্দুমাত্র দরদ নেই।

৩০ ডিসেম্বর প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রবক্তা মহম্মদ হাবিল আগের বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করে জানান — লাদেন পাকিস্তানের সীমান্ত শহর পেশোয়ারকে ভিত্তিভূমি হিসেবে ব্যবহার করছে — "সে নিশ্চয়ই পেশোয়ারে রয়েছে— উগ্রবাদী পার্টি জামাত্-ই-উলেমা-ই-ইসলামের প্রধান ফজলুর রহমানের ছত্রছায়ায়।" "আমাদের ইন্টেলিজেন্স একদম নির্ভুল। আমরা সেইসব তালিবান কম্যান্ডারের নামও বলতে পারি, যারা লাদেনকে আফগানিস্তানের অপর প্রান্তে যেতে সাহায্য করেছে।"

হাবিল জানান — আফগানিস্তান লাদেনকে গ্রেপ্তারের জন্যে দায়ী নয় — আমরা আর দায়ী নই। সে আমাদের দেশ আগেই ছেড়ে চলে গেছে। এখন থেকে এটা পাকিস্তানের দায়িত্ব। সে নিশ্চয়ই আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতা করবে লাদেনকে গ্রেপ্তারের জন্যে। ইতিমধ্যে, আফগান সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় অবশেষে একটি মতৈক্যে পৌঁছেছে যে বিদেশী পীস কীপিং ফোর্স (শান্তি রক্ষক সেনাবাহিনী) আফগানিস্তানে মোতায়েন করা উচিত। একথা বিদেশমন্ত্রী আবদুল্লা জানান ৩০ ডিসেম্বর। এইভাবে ২০০১ সালের শেষে আই এস আই-এর কুকর্ম তুঙ্গে উঠেছে তালিবানদেরে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে। *(চলবে)*

Swastika
2 February - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

একজন বনবাসী প্রধানমন্ত্রী চাই

(১ পাতার পর)

আমাদের দেশের আইনের ভিত্তি বাইবেল বা খৃস্টান ধর্মমত নয়। দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি জন অ্যাডামস্-ও একই কথা বলেছিলেন। তৃতীয় রাষ্ট্রপতি টমাস জেফারসন নিজে একজন স্বনামধন্য বিচারপতি ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'বাইবেলের ভগবান তিনমাথাওয়ালা রাক্ষস, ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর, অন্যকে আক্রমণকারী এবং মেয়েদের পিছনেই ধাবিত হয়। এরকম এক ভগবানকে দেশের শাসনব্যবস্থায় কোথাও স্থান দেব না।' আর আমেরিকার ১৭তম রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন বলেছেন, 'যীশুখৃস্ট আমার ভগবান নয়, বাইবেল আমার ধর্মগ্রন্থ নয়, খৃস্টান ধর্ম আমার ধর্ম নয়।' তাঁদের ওই বক্তব্যের কারণ হল খৃস্টান ধর্মের ২০০০ বছরের ইতিহাসকে তারা ভালোভাবে জেনেছেন। এখন তো যারা বাইবেল পড়েনি তারাই খৃস্টান হচ্ছে, আর যারা বাইবেল পড়ে ফেলেছে তারা খৃস্ট ধর্মমত পরিত্যাগ করছে।

ইউরোপে একজন খৃস্টানকে একদিন চার্চে আনতে যে খরচ হয় সেই খরচে ৭০০ জন ভারতীয়কে খৃস্টান করা যায়।

আমরা কতজন বাইবেল পড়েছি? কীন জেমস-এর বাইবেল পৃথিবীতে স্বীকৃত। এটা ইন্টারনেটে নিঃশুল্ক পাওয়া যায়।

ইউরোপে মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর বাইবেল ছাপা হয় ও লোকেদের হাতে হাতে তা যেতে থাকল। লোকে বাইবেল পড়ল আর, চার্চে যাওয়া কমাতে লাগল। এখন তো তা শূন্যের কোঠায় পৌঁছেছে। সারা ইউরোপে মাত্র তিন শতাংশ লোক আস্থার কারণে চার্চে যায়। আস্থা স্থির রাখার কারণে বাইবেল পাঠ করা বন্ধ করছে শিক্ষিত বিজ্ঞান লোকেরা, সারা ইউরোপে একারণে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। প্রগতিশীল দেশ বলে চিহ্নিত হল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশে লোকেরা চার্চে যান না। এজন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, বড় সাইজে, রবিবার চার্চে এলে বিনা পয়সায় মদের বোতল দেওয়া হবে। এই হল ইউরোপে চার্চ ও খৃস্টান ধর্মের অবস্থা। এরপর ও চার্চে যাবার লোক পাওয়া যাচ্ছে না। সেজন্য বড় বড় চার্চ নিলামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। আর সেসব চার্চ কিনছে, ইসকন, স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায় এবং অন্যান্য হিন্দুরা। সেখানে হিন্দুদের দেব-দেবী, রাম, কৃষ্ণ, শিবের মন্দির হচ্ছে, হিন্দুরা তো মন্দিরে যাচ্ছেনই সেইসঙ্গে শ্বেতকায় ইউরোপীয়রাও বিরাট সংখ্যায় মন্দিরে আসছেন।

এদেশে খৃষ্টানীকরণের তীব্র সমালোচনা করে রবিকুমারজী বলেন, ইউরোপে পাদ্রী ও নানদের অভাব মেটানোর জন্য কেরল থেকে গরীব ঘরের মেয়েদের মাসিক বেতনের ভিত্তিতে (২০০০ টাকা) নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাদেরকে প্রথমে সিস্টার ও পরে নান করা হচ্ছে। আর পাদ্রীরা, ফাদাররা তাদেরকে কলঙ্কিত করার পর তারা আর দেশে ফেরারই অবস্থায় থাকে না। আর ইউরোপে একজন খৃস্টানকে একদিন চার্চে আনতে যে খরচ হয় সেই খরচে ৭০০ জন ভারতীয়কে খৃস্টান করা যায়। সেজন্য এখন এশিয়া ও আফ্রিকায় খৃস্টানীকরণ চালানো হচ্ছে।

তিনি ভারতমাতাকে জগজ্জনীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আর একটু বেশি জোর লাগিয়ে কাজ করে যাওয়ার কথা বলেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, এই সময়েও ভারতবর্ষ ধনে, বিদ্যা-বুদ্ধিতেও মহিলা নেতৃত্বে পৃথিবীর শীর্ষে রয়েছে। পোখরান বিস্ফোরণের পর আমেরিকা তিনরকম প্রতিবন্ধ—(ঋণ দেবেনা, ভিসা দেবে না, প্রযুক্তি দেবে না) লাগিয়েও ভারতকে কাবু করতে পারেনি। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা নিজেরাই রকেট উৎক্ষেপক তৈরি করেছেন, আমেরিকার কোম্পানীগুলো চালু রাখতে ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্দের ভিসা দিতে বাধ্য হয়েছে। ভারত ঋণ মিটিয়ে বিদেশী মুদ্রার তহবিল গড়েছে। বিশ্বের প্রথম আটজন ধনী ব্যক্তির চারজনই ভারতীয়—লক্ষ্মীনিবাস মিত্তল, আম্বানী ভাইয়েরা এবং শিল্পীর কে পি সিং। এর কারণ এদেশের মানুষ—দেবী সরস্বতী, ধনদাত্রী মা লক্ষ্মী এবং শক্তিদায়িনী মা দুর্গার আরাধনা ও পূজা করে।

সভার প্রধান অতিথির ভাষণে প্রদীপ চোপড়া বলেন, ধন দিলে বাড়ে, সেজন্য সকলের বিশেষত ব্যবসায়ীদের কল্যাণ আশ্রমের মতো সেবাকাজে আরও বেশি করে ধন দান করা উচিৎ। সভার সভাপতি ভোলানাথ চৌধুরী বলেন, শুধু পার্থিব বস্তু নয়, জনজাতি সমাজের স্বাভিমানও জাগরণ করতে হবে। সভার শুরুতে মঞ্চস্থ সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের ছবিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। কল্যাণ আশ্রমের পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডিবাসী প্রধান কর্মকর্তা নাগরঞ্জন গাঙ্গুলিকে শাল, শ্রীফল ও মানপত্র দিয়ে বিশেষ সম্মানিত করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে তিনি শুরু থেকেই নিজেকে কল্যাণ আশ্রমের কাজে নিয়োজিত করে রেখেছেন। এদিন সভা পরিচালনা করেন শ্রীমতী স্নেহলতা বৈদ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন গোপালরাম গুপ্তা। সভার শেষে কল্যাণ আশ্রমের সদস্য-সদস্যারা 'রাম সে-তু হ্যায়' নাটক মঞ্চস্থ করেন।

(মঞ্চে বাঁদিক থেকে) সত্যগোপাল রায়, রবিকুমারজী, ভোলানাথ চৌধুরী, প্রদীপ চোপড়া, নাগরঞ্জন গাঙ্গুলি, শঙ্করলাল হাকিম ও বিশ্বনাথ নারসারিয়া।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের ধারণা পাল্টে দিয়েছে 'সিল'

প্রণব প্রতিম পাল, কলকাতা ।। উত্তর-পূর্ব ভারত প্রকৃতিক দিক থেকে অত্যন্ত মনোরম। হিমালয়ের কোলে প্রাকৃতিকভাবে বড় হয়ে ওঠে এই অঞ্চলের অধিবাসীরা। নিতান্ত সহজ-সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত তারা। আর এইসব মানুষের সরলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ফায়দা তুলতে ব্যস্ত রাজনৈতিক নেতারা। যার পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রসদ যোগান দিয়ে চলেছে বেশ কিছু বিদেশী রাষ্ট্র। ফলে জন্ম নিয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি।

যুব বিকাশ কেন্দ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগরিকদের মন থেকে ভারত বিরোধী মনোভাব সম্পূর্ণ রূপে মুছে দিতে বদ্ধ পরিকর। যুব বিকাশ কেন্দ্র তাদের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল সিল। আর এই সিল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের ধারণাকে অনেকটাই পাল্টে দিতে সফল হয়েছে। কী এই সিল? স্টুডেন্টস্ এক্সপিরিয়েন্স ইন্ ইন্টার-স্টেট লিভিং (SEIL)। উত্তর-পূর্বাঞ্চল যে ভারতেরই অঙ্গ। এমন ধারণাটা তৈরি করেছে সিল। অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের অন্যতম প্রকল্প হল সিল। বিদ্যার্থী পরিষদ সিল ট্যুরের মধ্য দিয়ে নাগাল্যান্ড, মণিপুরসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোর ছাত্র-যুব শক্তিকে নতুন দিশা দেওয়ার পরিকল্পনা নেয়। ধর্মীয় উগ্রবাদী সংগঠনগুলো উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগরিকদের ভুল বুঝিয়েছিল। তারা (ধর্মীয় উগ্রবাদী সংগঠন) বলেছে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগরিকদের চেহারা, বেশ-ভূষা (পোষাক-পরিচ্ছদ), খান-পান, রীতি-রেওয়াজ ভারতের নাগরিকদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতের অন্যান্য রাজ্যে বসবাসকারী ভারতীয়রা নাকি এই অঞ্চলের (উঃ-পূর্বাঞ্চল) নাগরিকদের ভারতীয় বলে মনে করে না। ফলে তৈরি হয় ব্যবধান। আর এই ব্যবধান থেকেই একের পর এক বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের জন্ম।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগরিকদের খাদ্য, রীতি-রেওয়াজ, পোষাক-পরিচ্ছদ আলাদা হলেও, ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে তাদের পরম্পরাগত অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীরা ভারতের সন্তান। এই অনুভূতি জাগ্রত করতেই সিল ট্যুরের আয়োজন। এই উদ্যোগ খোদ যুব বিকাশ কেন্দ্রের। ১৯৬৬ সালে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ছাত্র-যুবদের নিয়ে সিল ট্যুর প্রথম শুরু হয়। এক মাসের সিল ট্যুরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির সাথে পরিচয়ের সুযোগ হয় সদস্যদের। বিভিন্ন রাজ্যের খাদ্য, রীতি-রেওয়াজের সঙ্গে পরিচিত হয় তারা। যা সত্যিই রোমাঞ্চকর। সিল ট্যুরের সদস্যদের ভারত ভ্রমণের সময় বিভিন্ন রাজ্যের স্থানীয় কার্যকর্তাদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সেই রাজ্যের সেই পরিবারে থাকার ফলে পারস্পরিক ভাব-বিনিময় হয়। তৈরি হয় আত্মীয়তার সম্পর্ক। স্বভাবতই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ন্যাশন্যাল ফিলিংস তৈরি হয়। গত ডিসেম্বর, ২০০৮ সালে গৌহাটি থেকে সিল তার যাত্রা শুরু করে। যুব বিকাশ কেন্দ্রের প্রকল্প আধিকারিক তথা সিল ট্যুরের সংযোজক নব বুজর বড়ুয়া জানান, নর্থ-ইষ্ট যোগাযোগের দৃষ্টিতে ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে অনেকটা পিছিয়ে। ফলে এখানকার নাগরিকদের ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়েছে। সিল ট্যুরের ফলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নাগরিকদের সাথে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের নাগরিকদের 'হার্ট টু হার্ট' রিলেশন তৈরি হয়েছে। এটা একটা সাইলেন্ট মুভমেন্ট।

'সিল' ট্যুরে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ। ছবি ঃ পরীক্ষিত রায়চৌধুরী ও নীলঙ্কর দাস

সিল ট্যুরে অংশ নিয়েছিল মণিপুরের রোহিতা শর্মা। একমাস ধরে ভারত ঘুরেছেন তিনি। দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী রোহিতা বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চল অবহেলিত। আমাকে বোঝানো হয়েছিল, ভারতের জনগণ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বসবাসকারী নাগরিকদের ঘৃণা করে। কিন্তু সিল ট্যুরে এসে বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন পরিবারে থেকে আমার ধারণাটা পাল্টে গিয়েছে। সবাই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নতি চায়। আমি দারুণ ভাগ্যবতী।

অসমের নবনীতা নাথ বলেন, সিল ট্যুরে যাওয়ার আগে আমার মনে অনেক প্রশ্নের উদয় হয়েছিল। ভেবেছিলাম দক্ষিণ ভারতের লোকেরা কেমন হবে। তাদের সংস্কৃতির সাথে আমাদের সংস্কৃতির মিল হবে কি না ইত্যাদি। সিল ট্যুরে গিয়ে আমার সব প্রশ্নের সমাধান হল। আমরা যেইসব রাজ্যে গিয়েছি, সেইসব রাজ্যের স্থানীয় কার্যকর্তাদের পরিবারে থেকেছি। তারা আমাদের তাদের নিজেদের পরিবারের সদস্য হিসাবে দেখেছেন। ভালোবেসেছেন।

সিল ট্যুরে ১১ জন ছাত্রীসহ মোট ২৪ জন মণিপুর, অরুণাচল প্রদেশ ও অসম প্রান্ত থেকে অংশ নেয়। সিল ট্যুর ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে গত ১০ জানুয়ারি কলকাতা শহরে পৌঁছায়। বিদ্যার্থী পরিষদের কলকাতা শাখার পক্ষ থেকে তিলোত্তমা নগরীতে তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। সিল-এর সদস্যরা গত ১১ জানুয়ারি কলকাতার বিভিন্ন স্থান ঘুরে দেখেন।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com